রাঙ্গাশাঁখা

"জননী বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহিনা অর্থ চাহিনা মান
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল কমল চরণে স্থান"

৺দ্বিজেন্দ্রলাল।

শ্রীঅনুরূপা দেবী

[illegible]

প্রকাশক—
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সরকার।
৭৫।১।১ হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

মডার্ণ প্রিন্টিং হাউস হইতে
শ্রীবিনোদ বিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত।
২৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

খিড়কিতে লোক জড় করিতেছিল, বৃদ্ধ দেওয়ানজি অন্নপূর্ণার অনুরোধে দুই একবার থামাইবার চেষ্টা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ব্যর্থ হইয়াই ফিরিতে হইয়াছিল।

ডাক্তার একজন দুইজন ক্রমে তিন চারিজনই আসিয়া পৌঁছিলেন, অনেকক্ষণের চেষ্টা ও যত্নে বহুক্ষণের পর রোগী চক্ষু মেলিলেন, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি একটিও কথা কহিতে পারিলেন না, অবশেষে নষ্ট স্মৃতি পুনঃ সংগ্রহ ও ঘোর দুর্ব্বলতা ঈষৎ অপনীত হইলে সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া সম্মুখস্থ ডাক্তারের দিকে চাহিয়া হতাশার স্বরে কহিলেন, "আমার অবস্থা সব শুনেছ ডাক্তার বাবু! আমি তো যাচ্চি, ছেলেটাকে একেবারে ভাসিয়ে চল্লুম"।

সান্ত্বনার কোন কথা ছিল না তথাপি ডাক্তার বাবু কথা বানাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। বলিলেন, "নেহাত অবিচার হ'ল এখন হাইকোর্টেও খাঁটি বিচার হয় না; তা আপনি অমনি অমনি ছাড়বেন কেন? প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করুন।"

নিবিড় হতাশার মধ্যেও যেন একটা আলো দেখা গেল, কিন্তু আলোটা অত্যন্ত ক্ষীণ। বিষাদের হাসি হাসিয়া হৃতসর্ব্বস্ব জমীদার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "প্রিভিকাউন্সিলে, ওঃ সে যে অনেক খরচ। ঐতেই আমায় সর্ব্বস্বান্ত করেছে, জানিনে চারিদিকের দেনায় ঘর বাড়ী পর্য্যন্ত বিকিয়ে যাবে কিনা, না না, আর আমার কোন আশা নেই, আমায় এমনি করেই যেতে হবে!"

এতক্ষণের পর অন্নপূর্ণার চক্ষু ভেদ করিয়া দুই ফোঁটা উত্তপ্ত অশ্রুজল তাহার অজ্ঞাতসারে সহসা তাহার শ্বশুরের কপালের উপর ঝরিয়া পড়িল। রোগী চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন, "কেও?"

মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় বধূ সহসা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল, সম্মুখেই একজন বাহিরের লোক রহিয়াছেন।

রোগী দুর্ব্বল হাত তুলিয়া সস্নেহে তাহা বধূর মস্তকে প্রদান করিলেন মনের আবেগে বহুক্ষণ রুদ্ধ কণ্ঠ থাকিয়া সহসা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া ফেলিলেন, "মা, মা, তোকে কোথায় বসিয়ে রেখে যাচ্চি! তুই যে আমার ঘরের লক্ষ্মী"

"লক্ষ্মী! আর হলেম কই বাবা! আপনি স্থির হোন, আপনি ভাল থাকলেই আমাদের সব; আমাদের টাকায় কাজ নেই।"

তখন ঘরে আর কেহ ছিল না, ডাক্তারদেরই আদেশে ঘরের রথ দোলের ভিড় কমাইয়া কেবলমাত্র বাড়ীর পারিবারিক ডাক্তার ও দেওয়ানজি এবং দুই একজন সুশ্রূষাকারী আত্মীয় মাত্র ছিলেন, চারিদিকে চাহিয়া দীনদয়াল দেওয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিহির কই? তাকে তো দেখছি নে।"

দেওয়ানজি একটু মাথা চুলকাইয়া কাশিয়া উত্তর দিলেন, "মিহির বাড়ী নেই, সে কোথায় শীকারে গেছে, তা আমি তাকে ডেকে আনবার জন্যে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি।"

দীনদয়াল দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, "সে সংসারের কোন দায়িত্বই তো কখনও ঘাড়ে করে নি, পড়াশুনা ও খেলা নিয়েই এতদিন কাটিয়েছে। হা ভগবান! একেবারে দুধের ছেলের ঘাড়ে আমি কি দায়িত্বের ভারই চাপিয়ে যাচ্ছি, আমি যে মরণেরও শান্তি পাচ্চি নে!"

আবার একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, ক্ষণপরে বলিলেন,—"প্রিভি কাউন্সিলে একবার শেষ চেষ্টা করবার বড় ইচ্ছে যাচ্চে, যদি বাঁচিতো আমি যেমন করে পারি একবার চেষ্টা দেখবো, কিন্তু যদি সময় শেষ হয়ে থাকে তা হলে এই পর্য্যন্ত, মিহিরকে বলবারতো আমার কিছুই নেই।"

অত্যন্ত মৃদুস্বরে শ্বশুরের কানের কাছে নত হইয়া বধূ অন্নপূর্ণা কহিল, "বাবা আপনি এখন একটু স্থির হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করুণ এর পরে এ সব কথা হবে, আমি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করবো।"

বৃদ্ধ বিস্ফারিত চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, "মা তুমি?" কথাটায় গৃহের অপর প্রান্তে মৃদুস্বরে কথোপকথনে নিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়কেও বিস্ময় চকিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহারাও বিস্মিত কৌতূহলের সহিত সুকঠিন প্রতিজ্ঞা গ্রহণোদ্যতা বালিকা বধূর পানে চাহিয়া দেখিলেন। সূক্ষ্ম বস্ত্রান্তরালে সেই সৌন্দর্য্যললিত মুখের যে একটুখানি অস্ফুট আভাষ প্রকাশ পাইতেছিল তাহার মধ্যে কঠোর কর্ত্তব্য পরায়ণতার একটি দৃঢ়তাময় গাম্ভীর্য্য তাহাকে শুধুই যে মহিমা প্রদান করিয়াছিল তা নয় সমধিক উজ্জ্বল করিয়াও তুলিয়া ছিল। তাহার দ্বারাই কথাটার অসম্ভবতাকে সম্ভবত্ব প্রদান করিতে পারে, অবিশ্বাসের মৃদুহাসি ভক্তির উচ্ছ্বাসে পর্য্যবসিত হয়। দৃঢ় অবিচলিত কণ্ঠে অন্নপূর্ণা উত্তর করিল, "হ্যাঁ বাবা, আমিই আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করবো, আমার গহনাগুলো সবই আছে, আর টাকাও আমার কাছে আছে তো কিছু।"

"অন্নপূর্ণা বড় ঘরের মেয়ে, তাহার কিছু স্ত্রীধন ছিল। এ প্রস্তাবে দীনদয়াল সহসা সম্মত হইতে পারিতেছিলেন না, অবশেষে আশার মোহিনী কুহক তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়া সম্মত করাইল।

মিহির অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া সেই ধূলামাখা আজানু-জুতা ও হাতের বন্দুক শুদ্ধ পিতার ঘরে ঢুকিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকিল "বাবা!"

তখন রোগী একটু শান্ত হইয়া ঘুমাইয়াছেন। অন্নপূর্ণা মাথার কাছে বসিয়া বাতাস করিতেছে, পদতলে দেওয়ানজি ও অদূরে একজন দাসী মাত্র বসিয়া আছে। মিহির সাবধানে পা টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া মার কাছে গেল। দয়াময়ী তখন একাকী নিজের শয়ন ঘরের মেজেতে চুপ করিয়া পড়িয়াছিলেন, আগতপ্রায় বিপদের পূর্ব্ব সূচনায় তাঁহার অশান্ত হৃদয় কিছুতেই যেন প্রবোধ মানিতেছিল না। স্বামীর পরিবর্ত্তিত মুখের পানে চাহিয়া সেখানেও বসিতে পারিতেছিলেন না অথচ দূরেই

থাকিয়া প্রাণেও স্বস্তি নাই। কেবলি আসন্ন বিপদের আতঙ্কে থাকিয়া থাকিয়া প্রাণের মধ্যে হু হু করিয়া উঠিতেছিল, সতী ভবিষ্যৎ দারিদ্র্যের কথা ভাবিবার অবকাশ এ পর্য্যন্ত পান নাই, নিজের উপর উদ্যত বজ্রের মরণান্তিক নিষ্ঠুর আঘাতের কল্পনায়ই চিত্ত তাঁহার উদ্ভ্রান্ত আকুল। পুত্রকে দেখিয়া উর্দ্ধস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবা আমাদের কি হবে?" ছেলে নিশ্বাস ফেলিল কিন্তু পূর্ণবিশ্বস্ততার সহিত শান্তচিত্তে কহিল, "ঈশ্বরতো অবিচারক নন মা নিশ্চয়ই আমাদের আর কোন বিপদ হবে না। ঐতেই আমাদের সমুদয় অশান্তি কেটে গেল বোধ হয়।"

২

বিশ্ব সংসারের মহান স্রষ্টা নিশ্চয়ই অবিচারক নহেন; কিন্তু মানুষের ভাগ্যদেবতাকে সকল সময় খুবই হৃদয় সম্পন্ন বলিয়া অনুভব করা যায় না। বিপদের বার্ত্তা আকাশের মেঘের ডাকের মত যখন একপ্রান্তে ঘোষিত হয় তখন তাহার সাড়া প্রায়ই অপর প্রান্ত হইতে ফিরিয়া আইসে। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের ও অস্বাভাবিক অদৃষ্ট ভঙ্গের তীব্র আঘাতে সোনাগঞ্জের জমীদার দীনদয়াল মিত্র অত্যল্প দিনের মধ্যেই দীর্ঘকাল ব্যাপি মোকর্দ্দমার জ্বালা পুনঃ প্রজ্বলিত না করিয়াই চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি প্রিভিকাউন্সিল অপেক্ষা অন্য কোন বড় দরবারে এই ভ্রমাত্মক বিচারের বিরুদ্ধে আপীল উপ- স্থিতকরিয়া ছিলেন কি না বলা যায় না, তবে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, সে আদালতে আপীল দাখিল করিবার জন্য অপেক্ষা থাকে না, সেখানের জজের কাছে বিচারের আড়ম্বর করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইবার প্রয়োজন হয় না, আপীলের পূর্ব্বেই সেখানে বিচার হইয়া বিচার ফলও প্রদত্ত হইয়া যায়।

পিতার মৃত্যুতে মিহির চারিদিক অন্ধকার দেখিল। জীবনের এই বাইশ বৎসর সে কেবল পড়াশুনা ও আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া আসিয়াছে, অভাব বা বিষাদের সঙ্গে এপর্য্যন্ত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় ঘটিয়া উঠে নাই। জীবনে বিপুল আশা ও যথেষ্ট উদ্যম, সম্প্রতি মাত্র সে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সাহায্যে ও সহযোগে এখানে একটী এণ্ট্রান্সস্কুল খুলিয়া দিয়াছে, বালিকা বিদ্যালয়ের কল্পনা তাহার এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

প্রথম কয়দিন কাটিলে পিতৃ কর্ত্তব্য শেষ করিবার মহাভার পড়িল। এ সময়ে নূতন জমীদারের পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারীর কিছুমাত্র অভাব ঘটিল না। উদ্যোগ দেখিয়া বৃদ্ধ দেওয়ানজি দুঃখিত হইয়া মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, "এত সমারোহ করবার তো এখন তোমর অবস্থা নয় মিহির, সংক্ষেপে সার।" মিহির জিহ্বা দংশন করিল,"সেও কি হয়! বাবার কাজ, তাঁর উপযুক্ত রকমে না করলে লোকে আমায় বলবে কি? যেমন করেই হোক এটি আমায় করতে হবে"।

দেওয়ানজি এ যুক্তির অসারতা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু চিরমর্য্যাদাভিমানী ধনীবংশধরগণের রীত্যানুসারে মিহির নিজের সঙ্কট অবস্থা বুঝিয়াও পিতৃশ্রাদ্ধে কার্পণ্য দেখাইতে কুণ্ঠিত হইল, বলিল, "আমাদের অনেক ধার হয়েছে, তা আমি জানি, তা অন্য সব খরচ কমিয়ে সে আমি ক্রমে সবই শুধ্‌রে তুলবো দেখুননা, আগে এটা চুকে যাক্।"

কিন্তু বৃহৎ ব্যাপার নির্ব্বিবাদে সমাপ্ত হইতে না হইতে পাওনাদারদের সসম্মান তাগাদা আসিয়া নবপিতৃশোক-সন্তপ্ত তরুণ চিত্তকে সহসা অত্যন্ত বিভীষিকা প্রদান করিল। কয়দিন দপ্তরখানার রাশি রাশি খেরো বাঁধান ধূলিমাখা পুরাতন খাতা ঘাঁটিয়া ও পিতার দলিলের বাক্সর কাগজপত্র অনুসন্ধান দ্বারা মিহিরের উকিল শীঘ্রই তাহাকে তাহার অবস্থার সঠিক

পরিচয় প্রদান করিল। সে পরিচয়ে কোন আশার আলোকও যেন কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না!

অলক্ষণা শ্যামচাঁদপুর কিনিবার পর হইতেই যে দুই সরিকে বিবাদ বাধে এবং যাহা লইয়া এই এগার বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকর্দ্দমায় জেলাকোর্ট এবং হাইকোর্টে লড়াই চলিতেছে; তাহার ফলে সোনাগঞ্জের মিত্রদের বড় সরিকের সমুদয় সম্পত্তি বন্ধক পড়িয়াছিল; এখন সুদে আসলে তাহা এমনি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে রক্ষা করিবার আর উপায় মাত্র নাই! মিত্র গোষ্ঠী চিরকালই দান ধ্যান লোক লৌকিকতার জন্য প্রসিদ্ধ। সে জন্য বিস্তর ধার দেনা সত্ত্বেও প্রাচীন বংশধরেরা পুরাতন চাল ছাড়িতে পারিতে ছিলেন না। তাহার উপর এত বড় একটা মোকর্দ্দমা— কাজেই নিরুপায় মিহির মাস খানেকের মধ্যেই তাহার পিতৃ পুরুষদের পুরাতন অট্টালিকায় রিক্ত হস্তে জেলা কোর্ট হইতে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার পিতৃদত্ত সম্পত্তির মধ্যে এই বহুদিনের অসংস্কৃত প্রকাণ্ড বাড়ীখানি, শোকাকুলা শয্যাশায়িনী মাতা ও বালিকা পত্নী এবং ছাড়িয়া যাইতে অসম্মত দুই জন চাকর দাসী ও বৃদ্ধ দেওয়ানজি মাত্র বাকী রহিল। এ ভিন্ন আরও পাঁচ সাত হাজার টাকা দেনা তখনও বর্ত্তমান।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা ইহার মধ্যে প্রায় জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। মিহিরের মাতুল বংশ এবং তাহার বাপের মাতুল বংশীয়েরা আশ্রয়চ্যুত হইয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তদ্ভিন্ন অন্য সকলেই প্রায় অভিশপ্ত জমীদারপুরী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মিহির নিজে কাহাকেও যাইতে বলে নাই।

সেদিন সন্ধ্যায় আলোকহীন কক্ষে কক্ষে ফিরিয়া মিহিরের বেদনাভরা হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল, এই কি সেই তাহাদের আনন্দ নিকেতন? কোন ঐন্দ্রজালিক তাহারা নিদারুণ ভোজবিদ্যা দ্বারা তাহাকে এমন

পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে? এ কয়দিনকার সচেষ্টরক্ষিত ধৈর্য্য এতক্ষণের পর বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিতে চাহিতেছিল; মিহির পিতৃবিয়োগের পর আজ প্রথম নিজের জন্য সান্ত্বনা খুঁজিতে লাগিল।

সংসারের আগাগোড়া সমস্তই বদল হইয়া গিয়াছে। অন্নপূর্ণা শ্বাশুড়ীর স্নানাহার ও তাঁহার সেবা সান্ত্বনা লইয়া এতদিন যেন একটু হাঁপ ফেলিবারও অবকাশ পায় নাই। এত বড় কাজটার ভারও ত সবই সেই তাহারি উপর! আজই প্রথম বধূর অশ্রু ম্লান মুখের পানে চাহিয়া দয়াময়ী সস্নেহে সবিষাদে কহিলেন—"একি শ্রী হয়ে গেছে মা! মাথাটা রুক্ষ, ময়লা কাপড়,—গায়ে একখানা গয়না নেই! আ আমার পোড়া কপাল, এমন করে কি থাকতে আছে! যাও মা—চুলটা বেঁধে একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে কাপড়টা ছেড়ে এসো।" নিশ্বাস ফেলিয়া বধূ বলিল "আজ থাক্‌না মা, তুমি এক্‌লা থাক্‌বে।"

দয়াময়ী দুঃখের হাসি হাসিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন,—"আমার আর এক্‌লা থাকা, তুমি যাও,—এতে আমার মিহিরের অকল্যাণ হয়, এখন ঐ টুকুই আমার সব।"

আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া অন্নপূর্ণা নিজের ঘরে চলিয়াগেল। তাহার চুল বাঁধা শেষ হইয়াছে এমন সময় মিহির হঠাৎ সে ঘরে প্রবেশ করিল, পিতার মৃত্যুর পর এই দুজনের নিভৃত সাক্ষাৎ! মিহির বলিল "অনি! আমার আর কিছুই নেই! আমি আজ পথের ভিখারী।"

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বেই সে কথা শুনিয়াছিল, তাই সহসা এ সংবাদের যে ভয়ানকত্ব তাহা তাহাকে বিহ্বল করিল না, সে কাছে আসিয়া স্বামীর বক্ষ লগ্ন হইল, ""কেন, "কিছু নেই, কেন? আমাদের অনেক আছে।"

"কি আছে অনি—শুধু তুমি আছ;— যে হতভাগা আমি,— সে ও আমার পক্ষে মস্ত পুরস্কার মনে করি। কিন্তু তাতেও ভয় করে

এ অদৃষ্টে যে কতক্ষণ আছ তাও জানি না। শোন অনি! এখনও এই বাড়ীটা পাঁচ হাজার টাকায় বাঁধা, প্রাণ ধরে এ বাড়ী আমি বিক্রি কেমন করে করি বল দেখি? এ যে আমার সাত পুরুষের ভিটে!"

অন্নপূর্ণা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন, বাড়ী বিক্রী করবে কেন? আমার টাকা তো আছে?" মিহির বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িল। "বলিল, তোমার টাকা আমি কেড়ে নেব না, তোমায়ও কি নিঃস্ব করবো শেষে!"

অন্নপূর্ণা অসন্তোষের সহিত বাধা দিয়া বলিল—"টাকা নিয়ে কি আমি পথে গিয়ে দাঁড়াব? কেন একি আমার বাড়ী নয়?"

লজ্জিত হইয়া মিহির বলিল "আচ্ছা, তাহলে নয় তাই নেব, অনি! তুমি এত কথা শিখ্‌লে কবে? এই সেদিনও যে তোমায় কথা কইবার জন্য কত সাধ্য সাধনা করতে হয়েছে।" অন্নপূর্ণা লজ্জিতা হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু যে অবস্থা সম্পন্নানগরীকে নদীগর্ভে এবং নদীগর্ভকে শ্যামল শস্যক্ষেত্রে অল্প সময়ের মধ্যেই পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে, সেই অবস্থাই এই লজ্জা মুকুলিতা নববধূকে কর্ত্তব্য পরায়ণা পত্নীর পদে উন্নিত করিয়াছিল: সেই মহাশক্তির অপরিহার্য্য দান সে অবজ্ঞা করিতে পারিল না, বলিল "বাবার শেষ ইচ্ছা, তোমার মনে আছে?"

মিহির দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ঘাড় নাড়িল, "আছে বই কি, প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করা তাঁর ইচ্ছা ছিল। তা পারলে ত কতকটা রক্ষা হতো। যদি সেখানে জিত্‌তে পারি তা হলে আর ভাবনা কি? শ্যামচাঁদপুরই আমাদের প্রধান জমিদারী। ঐটে গিয়েই আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, অথচ আমাদেরই হকের ধন!"

সাগ্রহে অন্নপূর্ণা বলিল, "আপীল করে দেখই না!"

"টাকা কই, অনি?"

"আমার টাকা।"

এবার মিহির হাসিয়া বলিল, "সে আর কত টাকা, তা থেকে পাঁচ হাজার বার করে নিলে আর কতই থাক্‌বে? তাতেই কি হবে, এ যে মস্ত মোকদ্দমা, অনেক কাগজ পত্র, মোকর্দ্দমাও অনেক দিন ধরে চল্‌বে, এতে ঢের খরচ। অন্নপূর্ণা প্রসন্নমুখে কহিল "কেন, আমার গহনাগুলিরও কিছু দাম আছে তো।"

মিহির এবার অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কাতর স্বরে বলিল,—"আমি তা পারব না, ধরো এতেও যদি হারি? না না তোমার এমন অবস্থা আমি কর্‌তে পার্‌ব না। তুমি ও চিন্তা ছেড়ে দাও।"

"কিন্তু তুমি না পারলেও আমায় পারতেই হবে, আমি বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি আর তিনিও তাতে সম্মতি দিয়ে গ্যাছেন; আমি সে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ কর্‌তে পারব না।"

মিহির অনেকক্ষণ চুপ করিয়া জানালার বাহিরে একটা ফুলে ভরা রঙ্গীন গাছের পানে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আশা নিরাশার সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে দৃষ্টি ফিরাইয়া স্ত্রীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞাপূর্ণ মুখের পানে চাহিল—আবেগের সহিত সহসা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কেন এমন প্রতিজ্ঞা করেছিলে অনি! কিন্তু যখন করেছ তখন তাই হোক, বাবার ইচ্ছা এবং তোমার কথাই থাক, নিশ্চয়ই ঈশ্বর আমাদের পরিত্যাগ করেন নি।"

৩

তাহার পর আবার দিনের পর দিন আসিতে এবং যাইতে লাগিল, বাগান বাড়ীটা যদিও দেনার জ্বালায় বিক্রী হইয়া গিয়াছিল এবং বিশ্রামের অবসর কালও, সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে তথাপি শান্ত চিত্ত

মিহিরের নিয়মিত উৎসবায়োজন বন্ধ যায় না, সে এখন তাহার অনাথদের জন্য স্থাপিত নূতন স্কুলের হেড মাষ্টার। সেই অনতি বৃহৎ স্কুলপ্রাঙ্গনে জ্যোৎস্না রাত্রি কোন দিন ব্যর্থ হইয়া ফিরিতে পায় নাই, পূর্ণিমা সম্মিলনীতে অন্নপূর্ণার স্বহস্ত প্রস্তুত খেজুরের গুড়ের সন্দেশ বা বহু চেষ্টা লব্ধ চন্দ্রপুলী যেমন পরিতোষ পূর্ব্বক ভক্ষিত হইত, পূর্ব্বেকার গার্ডেন পার্টিতে বহু চেষ্টা প্রস্তুত চপ্ কাটলেট'ও তেমন আদৃত হয় নাই। সঙ্গীত সভাগৃহের দৈন্যতায় দৃক্পাত না করিয়া মহা উৎসাহে সভা বাড়িইয়া চলিয়াছে, বক্তৃতার উৎসাহ ও ওজস্বিতার অভাব ঘটিত না, এখন বরং অবাধে সকলকার সঙ্গে মিশিয়া সকলের সহিত সমান স্থান গ্রহণ করিয়া মিহির তাহার পূর্ব্বাবস্থার অভাব অনুভব করিতে লাগিল। জেলখানা হইতে বাহির হইয়া দীর্ঘদিনের জন্য আবদ্ধ কয়েদী যেমন মুক্তির বাতাসে হাঁফ ফেলিয়া স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, মিহিরের চারিদিক হইতে তাহার সমুদয় ঐশ্বর্য্যের বন্ধন যখন একসঙ্গে খসিয়া পড়িল তখন সে যেন পিতৃগৃহ প্রত্যাগত নববধূর মত মুক্তির আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিল। একদিন সে স্ত্রীকে বলিল, "প্রিভিকাউন্সিলে আপীলটা যদি না করতুম অনি! তা হলে বড় ভাল হোত। ঐ টাকা গুলি নিয়ে বেশ ব্যবসা করা যেত।" অন্নপূর্ণা মাথা নাড়িল ধীরে ধীরে বলিল "বাবার ইচ্ছা পূর্ণ করা চাই ত"।

"সত্য" বলিয়া মিহির হাসিয়া আবার বলিল, "ঐ মোকর্দ্দমা মামলাতেই আমাদের মারলে, আমি এইটে উঠিয়ে অন্ততঃ আমাদের গামেও যদি আগেকার মতন সালিসী পঞ্চায়েতের নিয়ম করতে পারি সেটা কত ভাল হয় বল দেখি?"

সেবারকার পূর্ণিমা সম্মিলনীতে মিহির ঐ বিষয়েই আলোচনা করিল, নিজের অবস্থার উদাহরণ দেখাইয়া পুনঃ পুনঃ সকলকেই এ কার্য্যে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করিল। সেদিন সম্মিলনীতে

জেলাকোর্টের দুইজন বড় বড় উকিল ও উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বৃদ্ধ ব্যক্তি একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা হলে আমরা খাব কি ?"

মিহির উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সম্মিলনীর অন্যতম সভ্য অতুলকৃষ্ণ নন্দী তীব্র শ্লেষের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"আমাদের জমীদার বাবু আপনাদের মাসহরার বন্দোবস্ত করে দেবেন বোধ হয়।"

এ বিদ্রুপে মিহিরের ভক্তগণ অত্যন্ত চটিয়া উঠিল, দু'একজন 'রাস্কেল' বলিয়া কামিজের আস্তিন গুটাইয়া দাঁড়াইয়াও উঠিল। নন্দী মহাশয় কিন্তু তাহাতে ভয় পান নাই। তাঁহার এইরকমই একটা সুযোগের অপেক্ষা! কিন্তু শ্রোতাদলের মধ্যে অনেকেই এই ব্যাপারে ভয় পাইয়া গেল। বেগতিক দেখিয়া বৃদ্ধ উকিল তারাচরণ উঠিয়া আসিয়া উত্তেজিত যুবকদলকে থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু দলের ছেলেরা তাহাদের মাষ্টার মহাশয়ের অপমানের ক্রোধ সহজে ভুলিত না যদি সেই সময়েই মিহির তাহার অধিষ্ঠিত মঞ্চাসন হইতে নামিয়া তাহারি অপমানকারীর হাত ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা না করিত। নন্দী মহাশয় অত্যন্ত ভাল মানুষের মত কিছুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া কহিলেন,—"আরে মশাই! আমাদের অত ধরতে গেলে চলে না, আমরা পিঠে কুলো বেঁধে দুইকানে তুলো দিয়ে তবে পথে বেরুই। সাম্‌নে যাঁরা যত লম্বা সেলাম ঠোকেন, আড়ালে তাঁরাই আবার গাল না দিয়ে জল খান্ না' তা কি আর বুঝিনে!"

ছেলেরা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল, এতটা হীনতা স্বীকার করা কেন ?

মিহির বলিল "এটাও ত একটা আবশ্যকীয় কথা। তারাচরণ বাবু! কিন্তু আপনার মতন বিজ্ঞ লোকের উপযুক্ত কথা নয়। আপনিই সে দিন বলেছেন, শুধু চাকরীর উপর শ্যেন দৃষ্টি রাখিলে আমাদের আর চলবে না। আইনজীবিদের ব্যবসা ঠিক্ চাকরী না হইলেও

সৎ ব্যবসায় নয় এ ভিন্ন কত ভাল ভাল ব্যবসা তো করা যায়। যাঁরা একাজে আসেন তাঁরা সেই সব দিকে মনোযোগী হলে তাঁদের এবং দেশের উভয়তই কল্যান ঘটিতে পারে। কল্পনা করুন, যদি আমরা আমাদের এই গ্রামগুলিকে মোকর্দ্দমারূপ মহামারীর হাত হতে রক্ষা করতে পারি তা'হলে আপনাদের কয়জনের সংসার চলা কঠিন হবে। কিন্তু এই সদুপায়ের দ্বারা এতগুলি লোক যদি ধ্বংশের মুখ হতে রক্ষা পায় এবং ইহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তগণ যদি এই অবসরে শালিসীর ব্যবস্থা করেন তবে দেশের কত মঙ্গল সাধিত হয়!" বৃদ্ধ তারাচরণবাবু আনন্দের সহিত এই সম্বন্ধে চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

সোনাগঞ্জের স্বর্ণ ভাণ্ডার অত্যন্ত দীনাবস্থা হইতে ক্রমোন্নত হইতেছিল। ভদ্রলোকেরা সকলেই প্রায় নিজেদের প্রতিশ্রুতি স্মরণ রাখিয়াছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে চারিটি মামলা তাঁহাদের স্থাপিত পঞ্চায়েত সভা দ্বারা মিট মাট করা হইয়াছে দেখিয়া সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট। নিম্ন শ্রেণীগণের শিক্ষা বিস্তার কল্পে চাঁদার খাতায় মিহিরের সইটা মিহিরের চোখে নিতান্ত অনুজ্জ্বল ঠেকিলেও অন্যলোকে তাহার এ অবস্থায় ২০০৲ টাকা সই করা বিস্ময়ের বিষয় মনে করিল। অত্যন্ত কুণ্ঠিত মুখে মিহির যখন পত্নী অন্নপূর্ণাকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল তখন সে নিজের প্রতিশ্রুতির কথাটা কোনমতেই বলিতে পারিতেছিল না। অন্নপূর্ণা সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কিছু দেবে না?" মিহির নতমুখে আস্তে আস্তে বলিল, "দেওয়া উচিত বই কি!" "তবে দাওনা কত দেবে?"

মিহির এবার চেষ্টা করিয়া মুখ তুলিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "তুমিই বলনা?" "তা ২০০৲ টাকা না দিলে ভাল দেখাবে কি?"

মিহির হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, টাকাটা যে তাহার নয় অন্নপূর্ণার স্ত্রীধন, স্ত্রীর যথেষ্ট মান অভিমান ও ক্রোধ প্রকাশেও কিছুতেই সে ইহা

ভুলিতে পারে না। যাহার টাকা সে দেশের কার্য্যে স্বেচ্ছায় দান করে তাহাতে তাহার কিছুই বলিবার নাই। নিজেত সে দান করিবারও অধিকারী নয়।—বলিল, "ভাল দেখায় না•বলে আর কি করবে?" আমাদের ত আর সে দিন নাই, কোথা থেকে আর ওর বেশী দিতে পারি অনি!"

মিহির অন্নপূর্ণার সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের অবশিষ্ট দেড় হাজার টাকায় তাহার পৈতৃক সম্পত্তির একটা অংশ তখনও পর্য্যন্ত যেটা বন্ধক ছিল ছাড়াইয়া লইল। সেখানে তাহার আয় বেশী হইত না বটে; কিন্তু সেখানকার প্রজারা তাহার অত্যন্ত অনুগত ছিল তাহাদের লইয়া সেইখানে সে বয়ন শিল্পের শিক্ষা দান জন্য একটি তাঁত শালা খুলিল, এবং নিজেও কায় মন দিয়া তাহার সাহায্য করিতে লাগিল; জমিতে কাপাশের চাষেরও ব্যবস্থা হইতে ছিল।

প্রায় আজ বার বৎসর হইয়া গেল কৃষ্ণদয়ালের সহিত দীন দয়ালের ঐ জমী লইয়া মতবিরোধ হয়। সেই বিরোধ রাক্ষসটা যখন প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে একেবারে সীমা অতিক্রম করিয়া অবশেষে দীন দয়ালের বক্ষের উপর চাপিয়া পড়িয়া তাঁহার বক্ষ পঞ্জর পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল; তখন অপর পক্ষ কৃষ্ণদয়াল বাহিরে খাড়া থাকিলেও ভিতরে ভিতরে ইহারই শোধনশীল আলিঙ্গনে শুখাইয়া উঠিয়া ছিলেন। দীনদয়ালকে যাহারা সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিল কৃষ্ণদয়ালও সেই শোণিত শোধনকারীদের হস্ত হইতে মুক্তি পান নাই, তবে বিজয়ের গৌরব তাঁহাকে ধ্বংশের মুখ হইতে রক্ষা করিয়া ছিল এই পর্য্যন্ত। পাওনাদারেরা আশাহীন অবস্থায় যেমন ভয়ানক মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায় আশা থাকিতে তাহা হয় না।

আবাব বার বৎসর পরে মিহির একটা অনুজ্জ্বল সন্ধ্যায় অনেক

ভাঙ্গা গড়ার পর কৃত সঙ্কল্প হইয়া একেবারে কৃষ্ণদয়ালের বৈটকখানায় প্রবেশ করিল। সেখানে তখন লোকজন বেশি ছিল না কেবল বৃহৎ তাকিয়ার উপর প্রকাণ্ড শরীরের সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ভর রাখিয়া জমিদার মহাশয় রৌপ্য নির্ম্মিত অলবোলার সুদীর্ঘ নলে টান দিতে দিতে দেওয়ানের নিকট হইতে বৈষয়িক সংবাদ সকল শুনিতে ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে ধূম কুণ্ডলীর সহিত দুই চারিটী আদেশও প্রচার হইতে ছিল। ঘরের লতা পাতার চিত্র করা দেওয়ালে চওড়া ফ্রেমে আবদ্ধ ছবির উপর গিলটী করা দেওয়াল গিরিতে বাতির আলো জ্বলিতে ছিল। তাম্রকূটের সুগন্ধে ঘরে বায়ু মণ্ডল আমোদিত হইয়া রহিয়াছে। মিহির গৃহে প্রবেশ করিয়াই হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। এই ঘর জোড়া তক্তপোষের উপর সাফ জাজিমপাড়া বিছানা ও শ্রেণীবদ্ধ মোটা মোটা তাকিয়া লইয়া সমুদয় ঘরের দৃশ্যটা তাহার নিজের ঘরে তাহার পৈতৃক আমল মনে পড়িয়া গেল। যিনি সম্মুখে বসিয়া আছেন তাঁহার সহিত তাঁহার আকৃতিগত সাদৃশ্যও বড় অল্প নহে! সহসা তাহার সমুদয় সঙ্কোচ দূরে সরিয়া গেল। সে সম্মুখীন হইয়া প্রণাম করিল। কৃষ্ণদয়াল পদশব্দে মুখ তুলিয়া দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?" মিহিরের উন্মুখ হৃদয় মুহূর্ত্তে বিমুখ হইয়া আসিল, একি অপরিচিত মুখ লইয়া সে আজ তাহার চির অনাদৃত আত্মীয়তার দাবী করিতে আসিয়াছে!

কৃষ্ণদয়ালের এক্ষেত্রে কিন্তু কোন অপরাধই নাই। আজ বার বৎসর ধরিয়া যাহারা সংসার ক্ষেত্রে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইয়া আসিয়াছে, তাহাদের ঘরে কোন বালকটি বড় হইয়া কেমন দেখিতে হইয়াছে এ খবর কেমন করিয়া রাখা সম্ভব? মিহিরকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া কৃষ্ণদয়াল ঈষৎ বিরক্ত স্বরে কহিয়া উঠিলেন "কে বাপু একবারে হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলে? চাকরীর চেষ্টায় এসে থাকো তো কাছারী বাড়ীতে যাও না; এখানে কেন?"

দেওয়ানজী মিহিরকে চিনিত, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাধা দিল, বলিল, "উনি ওবাড়ির ছোট বাবুর ছেলে মিহির বাবু।"

"মিহির" বলিয়া বৃদ্ধ এমনি অদ্ভুত বিস্ময়ে তাঁহার চশমা জোড়ার মধ্য হইতে মিহিরের পানে চাহিলেন যে, লজ্জা ও অপমান তাহার হৃদয়কে বিদ্রোহের দিকে অত্যন্ত জোরে জোরেই টানিতে লাগিল। অল্প পরে বিস্ময় সম্বরণ করিয়া কৃষ্ণদয়াল বলিলেন, "তা কিছু বলবার আছে?"

তাঁহার স্বর পরুষতর হইয়া উঠিয়াছিল। মিহির মাথা নীচু করিয়া ঘাড় নাড়িল "না, আপনার সঙ্গে একবার শুধু দেখা করতে এলাম।"

কথাটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়,—অবিশ্বাসের সহিত জমিদার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতুষ্পুত্রের পানে চাহিয়া দেখিলেন, পরে একটু ভাবিয়া বলিলেন "তা বেশ করেছ, এতো তোমারই বাড়ী, দীনোই না, না বুঝে এত বড় কাণ্ডটা বাধালে, তা আমার কিছু দোষ নেই বাছা, আমি ওকে গোড়াতেই বলেছিলুম যে, ওটা যখন তুমি দখল পাচ্ছোই না, তখন আমায় কিছু কম টাকাতেই না হয় ছেড়ে দাও।"— মিহির অসহিষ্ণুতার ভাবে বাধা দিল, কহিল, "ওতো পুরাণ কথা, ও কথা আর কেন? এখন তো বাবা নেই, এখন আপনিই আমার একমাত্র অভিভাবক, আমাদের আর এখন পরের মত থাকাটা ভাল দেখায় না। আমাদের ভ্রম অপরাধ সব মাপ কর্ব্বেন, আপনি আমার পিতৃতুল্য।"

বৃদ্ধ সচকিতে সোজা হইয়া বসিলেন, বলিলেন, "তোমার বাড়িটাও বিক্রি হয়ে গেছে নাকি? কি চাকরি করতে না—সেটিও বুঝি খোয়া গেছে? তা আমি ত সে সব কিছুই সাহায্য তোমায় করতে পার্ব্বো না বাপু।"

মিহির রাগ করিতে গিয়া দুঃখের হাসি হাসিল, আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল, "না আপনার আশীর্ব্বাদে আমার কোন অভাব আপাততঃ নেই।"

কৃষ্ণদয়াল হাঁফ ছাড়িয়া কহিলেন, "বটে! তা ভাল, ভাল, তা একটা কথা বলি বাপু, তুমি যে ওই বিলাতে আপীলটা করলে; ওটা কি ভাল কাজ হোলো? এদিকে তো শুনছি হাতে এক পয়সাও নেই; বউমার গহনাগুলি পর্য্যন্ত সব বিক্রি হয়ে গ্যাছে। এ-শুধু শোনাই বা বলি কেন, নবীনকালীর বিয়ের জন্য তার বেশি ভাগ আমিই তো কিনে নিইছি। দিব্যি মুক্তোর মালা ছড়াটি! কানবালা, সিঁথি, বাজু, সব কখানিই বেশ, আর সস্তাও খুব হ'ল কিনা!"

মিহিরের মুখ বিবর্ণ হইয়া আসিল। রুদ্ধপ্রায় স্বরে সে কহিল, "বাবার শেষ আদেশ বলে আমরা বাধ্য হয়েই একাজ করেছি। তবু এখন মনে হয় ভাল করি নি। এর চেয়ে অন্যদিকে বাবার অনুমতি নেবার চেষ্টা করলেই ভাল করতাম। তিনি তো আমার মঙ্গলের ইচ্ছাতেই এ আদেশ করেছিলেন। যে টাকাটা এখনও নষ্ট হচ্চে, সেটা থাকলে তা'তে ব্যবসা করলেও এর চেয়ে ঢের বেশী লাভ হ'তো।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ ওই তোমার আর একটা পাগলামী! শুনছি নাকি তুমি কতকগুলো তাঁতিজোলা নিয়ে তাঁত বসাচ্চো?"

এতক্ষণে মিহির কথা কহিবার একটা যেন পথ পাইল, সে উৎসাহিত হইয়া বলিল, "কেন জ্যেঠামশাই, এতে অন্যায়টা কি? আপনিই বলুন তো জ্যেঠামশাই, এই যে এখন বার মাসই দেশে দুর্ভিক্ষ লেগে আছে, সত্যি কি আগে কখনও এমন হতো? এখন যে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকার ফসল বিদেশের শিল্প দ্রব্যাদির বদলে এদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি হচ্চে, এই জন্যই না এখানে এখন বার মাসে হাহাকার! ছুঁচ সূতাটী থেকে পরবার কাপড় খানি পর্য্যন্ত বিদেশ থেকে আসছে, এতে দেশের লোকের অন্নই বা হয় কোথা থেকে, আর মনুষ্যত্বই বা বজায় থাকে কিসে? আমরা যে একেবারে অন্ধ হয়ে বসেছি।"

কৃষ্ণদয়াল মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, একটু জোরের সহিত বলিলেন,—"কিন্তু বাপু আমি ও সব তোমাদের স্বদেশীর প্রতিজ্ঞা করতে বা তোমাদের ও পাগলামীতে চাঁদা টাদা দিতে পারবো না। ওসব কি বাপু, রাজার সঙ্গে তোমরা লাগতে চাও, এ কেমন ধারা কথা? অ্যাঁ! একি দুঃসাহস তোমাদের!"

"কে বল্লে আমরা রাজার সঙ্গে লাগতে চাই? এই ভারতবাসীর মত এমন রাজভক্ত প্রজা, জান্‌বেন জ্যেঠামশাই, রাজার নিজের দেশেও বোধ করি নেই। এখানের মাটিতে রাজার বিরুদ্ধ হওয়ার শক্তি ভগবান রাখেন নি। আমাদের শাস্ত্র বলে, রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাঁর, বিরুদ্ধ কে হতে পারে? না রাজবিদ্রোহের নাম গন্ধও আমাদের মধ্যে নেই, এ আমাদের দেশের নষ্ট শিল্প আর অবনত কর্ম্মশক্তিকে জাগাবার চেষ্টা,—অত্যন্ত সাধু চেষ্টা, মনুষ্য মাত্রেরই অবশ্য করনীয় কর্ম্ম মাত্র। আর কিছুই না। শিল্পের সঙ্গে রাজার সঙ্গে সংযোগ কি,—না আমাদের রাজার জাত ভায়েরা ব্যবসায়ে বণিক,—মাত্র এই টুকু! কিন্তু শুধু তারা কেন, এদেশ যে আজ জর্ম্মণ ও জাপান শিল্পে ডুবে গেছে, তা থেকে যদি দেশকে সামান্য একটু মুক্তি দিতে আমরা চেষ্টা করি কেন তাতে আমাদের মহানুভব রাজা অসন্তুষ্ট হবেন? তা হতেই পারেন না। এ মনে করলেই তাঁকে নীচু করা হয়।"

কৃষ্ণদয়াল ঈষৎ বিস্মিত ভাবে কহিয়া উঠিলেন "তবে সবাই বলে কেন যে রাজা এতে রাগ কর্ব্বেন?" মিহিরের চিত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে আপনার মনের আবেগে বলিয়া যাইতে লাগিল, "বলে কেন? আমরা নিজের দোষ পরের উপর চাপাতে বড় ভালবাসি; তাই বলে। বাস্তবিক স্বদেশভক্ত স্বজাতি হিতৈষী ইংরেজ আমাদের এই সব ছোট বড় উন্নতির চেষ্টাকে কখনই অসম্মান করতে পারেন না। আর আমাদের এই যে একটুখানি মনুষ্যত্বলাভের

চেষ্টা, এখানেও সেই স্বজাতি বৎসল স্বদেশ সেবক ইংরাজরাজই তো আমাদের আদর্শ! কেন তাঁরা আমাদের দেশ হিতৈষণার বিরোধী হবেন? তবে যারা দেশের নামে স্বার্থের সেবা করে, পূজা করিয়া দস্যু বৃত্তিতে বাহির হওয়ার মতই তাদের সে দেশ ভক্তি পূর্ণ রাজসীক! তারা দেশেরও শত্রু এবং রাজার ও মিত্র নয়! তাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।"

কৃষ্ণদয়াল একটু যেন বুঝিলেন, ঈষৎ প্রীতও হইলেন, ইতঃ পূর্ব্বে দেশের সেবা ও 'বোমা' এ দুইটা তাঁহার মনের মধ্যে যেন তাল পাকাইয়া একটা হইয়া গিয়াছিল, কহিলেন, "তা আমরাত ওসব ভাল বুঝি না, তবে রাজা রাগ না করলেই হলো।"

তখন মিহির ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত কহিল, "আপনাকে আমার একটি কথা বলবার আছে; একটু শুনতে হবে, আপনার ভালবোধ না হয় করবেন না। দেশের এই অন্নকষ্টের দিনে পাটের চাষ করানটা কি ভাল? তার চেয়ে বাংলার ধানের ক্ষেতে পূর্ব্বের মত ধানই ফলতে দিন, তা'তে অন্নাভাব কমবে, সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়াও কমবে।"

কৃষ্ণদয়াল বলিয়া উঠিলেন, "কে জানে বাবু তোমাদের কি রকম মত টত, পাটে লাভটি কেমন, সেটি বল দেখি?"

মিহির নতমুখে উত্তর করিল "শুধু লাভ দেখলেতো চলবে না জ্যেঠামশাই, দেশের লোক যে খেতে পাচ্চে না, সেটাওতো দেখতে হবে।"

দেওয়ান হরিহর হালদার সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "ঐ শুনুন! আমিও আজ সেই কথাই না বল্‌ছিলাম। সেটা করে কাজ নাই, কিছু লাভ বেশী হবে বটে, কিন্তু গরিব দুঃখীর বড় কষ্ট বাড়বে। এবার পুরা আকাল আসবে।"

মিহির বলিল, "আমার বোধ হয় তার চেয়ে আর এক কাজ করলেও বেশ লাভ করা যায়। প্রজাদের সমুদয় ফসল যদি আমাদের তরফ থেকে

কিনে ফেলা যায় তা হলে উগারা আর চালান দিবার জন্ম রালিদের এজেন্টকে বেচতে পারেনা; অথচ যদি জমিদার ঐ ফসল কুঠী বেঁধে রেখে, নিজের এলাকাতেই মহাজনদের আড়তে আড়তে তা বেচেন, তাহলে বাজারে মাগ্গির সময় লোকেরও খুব উপকার; অথচ নিজেরও যথেষ্ট লাভ থাকে।"

কৃষ্ণদয়াল ভাবিয়া বলিলেন "তা এটা বড় মন্দ কথা তো নয়! আচ্ছা আমি এ কথাটা পরে তখন ভেবে দেখ্‌বো। তা মিহির মনে করে যখন এসেছ, তখন এসো বাবা মধ্যে মধ্যে, তোমার কথা গুলি তো ভাল! তবে হ্যাঁ, দেশী নুন চিনি নিয়ে না কি কি সব করচো? ও সব কেন!"

"কি করি বলুন, গোরক্ত দিয়ে সাফ করা চিনি নুন কেমন করে খাই বা খাওয়া দেখি? তাই যাতে এ দেশে বিশুদ্ধ চিনি হয় তার জন্যই সামান্য একটু চেষ্টা করি মাত্র।" মিহির প্রণাম করিয়া উঠিয়া মৃদু হাসিল, বলিল, "আজ তবে আসি জ্যেঠামশাই!"

শেষ কথা গুলা কানে না তুলিয়াই কৃষ্ণদয়াল উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিলেন "হ্যাঁহে হরিহর, তাই নাকি?" দেওয়ানজী নিজে নিষ্ঠাবান হিন্দু, মানুষটাও বড় শান্ত সরল, অকপটে কহিলেন "আজ্ঞে একথা সত্য বই কি।"

"মহাভারত মহাভারত! তবে আমার বাড়ীতেও যেন ও দুটো জিনিষ আর না আসে তার ব্যবস্থা করে দাও! অ্যাঁ প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত তো! ছি ছি ছি! উঠছো নাকি মিহির? তা আজ এসো, কাল রাত্রে তোমার এই খানে নেমন্তন্ন রইলো, এসো, বসে বসে একটু কথা বার্ত্তা কওয়া যাবে। আহা দীনোর সঙ্গে ছোট বেলায় আমার কি ভাবই ছিল! মতিচ্ছন্ন ধরলো দুজনেরি, সেতো ধনে প্রাণেই গেল; আমার ও এই দশা!"

বহুদিনের রুদ্ধ স্নেহ-স্রোত আজ অন্তরালে অন্তরালে বহিতেছিল বলিয়া ঘোর বিষয়ী কৃষ্ণদয়াল এক মুহূর্ত্তে অনেক খানি উদারতা প্রদর্শন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মনে দীনদয়ালের শোচনীয় পরিণাম একটু খানি অনুতাপ ও আত্মগ্লানির উদয় যে না করিয়াছিল তাহাও নয়, তাই আজ তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়, প্রতিশোধ অনিচ্ছু পুত্রকে দেখিয়া তাহা সহসা একটু অধিক মাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আসল কথা, বৈষয়িক ত্যাগ স্বীকার করিতে তিনি যতখানি অনিচ্ছুক, হৃদয় বৃত্তির সম্বন্ধে ততদূর কার্পণ্য তাঁহার ছিল না। মিহির চলিয়া গেলেও তাঁহাদের অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারই কথা হইতে লাগিল। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বার বৎসর পরে দেখলুম—আহা বেঁচে থাক—দীনুর ছেলে, বড় ভাল!"

কৃষ্ণদয়ালের হঠাৎ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর অতখানি টান্‌কে অনেকেই ডাকিনীর মায়ার সহিত তুলনা করিলেও অনেকেই মনে মনে ইহাতে বিস্মিত ও আনন্দিত হইল। বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠ তাত এতদিন পরে সহসা অত্যাচারিত মৃত ভ্রাতার একমাত্র পুত্রকে কাছে পাইয়া অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া আসল কথাটা তিনি বিস্মৃত হইলেন না। বলিলেন, "তা বিষয়টা না হয় মিহিরকে ছেড়েই দিতুম, তা ছেলেটা আহাম্মুকি করে যে বিলেতে অপীলটা করে বস্‌লো,—এখন আর কি করা যায়! সেখানে যা হবার তাতো সব হয়েই গ্যাছে। দেখি আগে আপীলের কি ফল দাঁড়ায়;—তা আমি ছেড়েতো দিতেই পারতুম; তবে ঐ আপীলটারই জন্যেই বন্ধ রাখতে হলো!" মিহিরকে একদিন ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন "শুনলুম বৌমার নাকি হাতের বালা দুগাছি পর্য্যন্ত খুলে নিয়ে স্কুলের জন্য দিয়েছ? এ কি তোমার আহাম্মুকি!"

লজ্জায় ম্লান মুখে মিহির একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা আবার

আনন্দ প্রদীপ্তমুখে মুখ তুলিয়া বলিল "যে কাজ হাতে নিয়েছি, সে'টা যাতে ভাল রকমে চলে তার তো সম্পূর্ণরূপে চেষ্টা করা উচিত! আমার গরীব প্রজারা এবং গৃহস্থ বন্ধুরা যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আমার তো আর কিছুই ছিল না জ্যেঠামশাই।"

কৃষ্ণদয়াল বিরক্তভাবে বাধা দিলেন, "তা বলে ছেলেমানুষকে সর্বস্বান্ত করেও তোমার হলো না মিহির? মিত্তির বংশের বউকে শেষে কাঁচের চুড়ি পরালে? না হয় আমার কাছ থেকেই কিছু নিতে।" মিহিরের মুখ বিজয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, হাসিয়া সে বলিল "আপনি যদি অনুগ্রহ করে কিছু দেন, তা দিন না জ্যেঠামশায়! আপনি যদি এ সব কাজে সাহায্য না করবেন তবে আর করবে কে? তবে এ কথাটাও এখানে বলা দরকার যে, বালা আমি আপনার বউএর কাছ থেকে কেড়ে নিইনি, সেই জেদ করে আমায় নেওয়ালে, আর তার জন্যে তাকে কাঁচের চুড়ি পরতে হয়নি; সে হিন্দু মেয়েদের চির আদরের শাঁখা পরেচে।"

কৃষ্ণদয়াল একালের ছেলেমেয়েগুলির বিষয় বুদ্ধিহীনতা সম্বন্ধে অনেক আক্ষেপ করিয়া নগদ একশত টাকা ভ্রাতুষ্পুত্রকে দান করিলেন, বলিলেন, "এই নাও, ঐ'তে বৌমাকে বালা গড়িয়ে দাওগে, আর দেখ, সেদিন শশী বড় জেদ করছিল যে, সে তোমাদের স্কুলের জন্য কিছু সাহায্য করতে চায়, তা যা দরকার হবে টবে তা তুমি তাকেই বলো, আর না হয় ওটার নামটা আমার নামের সঙ্গে যোগ করে দিয়ে,—'কৃষ্ণদয়াল সেমিনারি' কি এই রকম একটা কিছু করে দিও। ওর যা খরচ দরকার তা আমিই না হয় দেবো। নিজের নামটাও তো এই উপলক্ষে রাখা হবে!"

মিহির যখন অন্নপূর্ণাকে সব কথা বলিল, তখন সকল বিবরণ শুনিয়া অন্নপূর্ণার মুখ খানি আনন্দে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, সে টাকাগুলি

বিনাবাক্যে আচলে বাঁধিয়া বলিল "বেশ হ'ল আমাদের মেয়ে স্কুলের জন্য একটা তাঁত হবে এখন।" মিহির একটু কুণ্ঠিত ভাবে স্মরণ করাইয়া দিল যে, ওটা তাহার বালার জন্য জ্যেঠামশাই দিয়াছেন, অন্যরূপ হইলে তিনি কি বলিবেন ? অন্নপূর্ণা মিহিরের পরিত্যক্ত চাদর খানা আন্‌লায় উঠাইয়া রাখিতে রাখিতে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তিনি যদি কিছু বলেন, তা হলে বলো, মিত্র বংশের বউ একশো টাকা দামের বালা পরায় তার শ্বশুর কুলের অপমান বোধ করে। টাকাটা তাঁর প্রথম স্নেহের দান ও অমূল্য আশীর্ব্বাদ স্বরূপে একটা পবিত্র কার্য্যের জন্যই গ্রহন করলুম। যেন পিতৃহীনাকে পিতৃ স্নেহে আশীর্ব্বাদ করেন, যাতে সে ক্ষুদ্র স্ত্রীলোক—তার ক্ষুদ্র চেষ্টা দ্বারা নারী কর্ত্তব্যের একটা পরিত্যক্ত অংশকে ধ্বংসের ধূলি ইঁটকের মধ্য থেকে টেনে তুলতে পারে।"

মিহির তথাপি বলিল "তোমার যা কিছু সবই আমি নে'ব অনি!"

অন্নপূর্ণা আবার কল কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, হাসিয়া বলিল, "তুমি নে'বে কি রকম! বাঃ! তোমার যেন একলারই কাজ, একলারই দেশ! আমাদের যেন এর মধ্যে কোন কর্ত্তব্যই নেই ? তোমরা আমাদের এমন হীন ভাব কেন বলোতো ?"

মিহির হার মানিয়া স্ত্রীকে আদর করিয়া বলিল "তোমার মতন স্ত্রী যদি সবাই পেতো অনি!" "রক্ষা করো, তাহলে কিছু ভাল হতো না। ভাল, একটা কথা শুনেছ ? ও বাড়ীর কুসুমঠাকুরঝি রোজ এবাড়িতে এসে আমাদের এই ছোটমেয়েদের পাঠশালায় এক ঘণ্টা করে বাংলা পড়িয়ে যাবেন বলেছেন, কদিনেই তাঁর একটা মত বদলেছে। বলছিলেন ;—'গৃহস্থের মেয়ে ঘর সংসার দেখে ও যে সময়টা তাস খেলে ঘুমিয়ে বা পরচর্চ্চা করে কাটায়, সে সময়টায় এরকম কাজ একটা নিলে নিজের এবং পরের অনেক উপকার হতে পারে।' ওবাড়ির দিদি,

ছোটবৌ ও মল্লিকা স্কুলে একটু একটু শিখতে আস্‌বেন। আজও বাড়ী থেকে আর আমায় কেউ সেমিজ জামা পরা নিয়ে বা পড়াশোনা নিয়ে গুরুমা বলে ঠাট্টা করেননি। বেশী টাকা না হলেও চেষ্টা দ্বারাও অনেক কাজ হয় একথাও ওঁরা প্রায় স্বীকার করেছেন, আর এ সব বিষয়ে একটু আধটু সাহায্য করতে ইচ্ছুকও হয়েছেন, তবে একটা বিষয়ে অনেকের এখনও মতদ্বৈত ঘোচেনি",—বলিয়া অন্নপূর্ণা হাসিয়া অন্য কথা পাড়িতে গেল, কিন্তু মিহির তাহার গোপন চেষ্টা দেখিয়া তাহাকে ছাড়িল না। জেদ করিয়া সেই কথাটা সে শুনিয়া লইল। কথা এই যে, 'মেয়ে মানুষ তাহার নিজের গায়ের গহনা খুলিয়া পরের কাজে দিলে তাহার বুদ্ধিবৃত্তিকে ঠিক প্রশংসা করিতে পারা যায় না! নিরালঙ্কার জমীদার বধূ তাহার ধ্বংশ প্রাপ্ত স্বামীর চেয়েও অবজ্ঞার পাত্রী, ইত্যাদি।'

এ বিষয়ে মিহিরের মনেও একটা বেদনা সর্ব্বদা জাগ্রত ছিল; তাই বড় অল্পেই সেখানে আঘাত পড়িত, সে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপীলটার জন্য সর্ব্বস্বান্ত না হয়ে যদি ঐ টাকাটায় একটা ব্যবসা করতাম তা হলে ঢের বেশী ভাল কাজ হ'ত, না হয় ভায়েরাই শ্যামচাঁদপুর ভোগ করতো, এযে, ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়, শুধু শব্দে টাকা গুলো ফুরিয়ে গেল, এতে কি ফল হবে? না জিতলে এতদিন পরে জ্যেঠামশায়ের যে স্নেহটুকু ফিরে পেয়েছি সেটুকু হয়ত হারাব। আর হারলে?"

মিহির একটু ভাবিয়া বলিল "আর কিছুই নয়, তোমার কাছে চিরকাল আমায় একটু লজ্জিত থাকতে হবে।"

অন্নপূর্ণা স্বামীর হাত ধরিয়া সাগ্রহে বাধা দিয়া বলিল "ওসব কথা অনেক শোনা গেছে, থামো!" তার পর বলিল, "তা সত্য বটে! আমরা উকিল মোক্তারকে সর্ব্বস্ব লুটিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আত্মীয়ের জন্য এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারি না, পরস্পরের ধ্বংশের জন্য সচেষ্ট হয়ে পরস্পরেই ধ্বংশ হই।"

প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে মিহিরের জয় হইল। যে দিন এসংবাদ সোনাগঞ্জে পৌছিল সেদিন পূর্ণিমা সম্মিলনী উপলক্ষ্যে স্কুল বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। মিহির তখন তাহার রবিবারের অবসর টুকু তাহার নিম্নজাতীয় ভ্রাতৃগণের সাহায্যে সুখাতিবাহিত করিয়া সম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিতে ছিল। মিহিরের উকিল সংবাদ দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলে গম্ভীর মুখে নিরুদ্যমভাবে মিহির তাঁহাকে স্কুল গৃহে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সর্ব্বপ্রথমের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে চলিয়া গেল।

কৃষ্ণদয়াল সেদিন ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিয়া মুখ তুলিলেন না, আপনার মনেই গড়গড়ার স্বর্ণখচিত রৌপ্য নল টানিতে টানিতে একখানা পুরাতন হিসাবের বই দেখিতে লাগিলেন। মিহির অকুণ্ঠিতভাবে ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া তাঁহার পদধূলি তুলিয়া লইয়া মাথায় দিল। সহসা যেন চমক ভাঙ্গার ন্যায় কৃষ্ণদয়াল চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "কে মিহির!"

মিহির জ্যেষ্ঠতাতের পায়ের নিকট বসিয়া বিনীতভাবে কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বিলেতের খবর"—কৃষ্ণদয়াল সহসা অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া উঠিলেন, "জানি হে জানি, তার আর হয়েছে কি? তোমার এ খবর এত কষ্ট করে না দিতে এলেও চলতে পারতো, আমার কৌন্সুলি, আমায় সে খবর দিয়েছেন"—সহসা মিহির আর্ত্তকণ্ঠে বাধা দিল, "জ্যেঠামশাই! জ্যেঠামশাই! আমার বাবা নেই আপনি আমার উপর এত নিষ্ঠুর হবেন না! আপনি আমায় এমন নীচ মনে করবেন না"—

কৃষ্ণদয়াল আঘাত প্রাপ্তের মত চমকিয়া থামিয়া গেলেন। মিহির বলিতে লাগিল, "আপনি আমার গুরুর ও গুরু, বাবার চেয়েও আপনি বড়, আপনার কাছে আমার সকল বিষয়েই সর্ব্বদা হার স্বীকার করে চলা উচিত। ছেলে মানুষ না বুঝে না ভেবে পিতৃ আদেশ মনে করে যে

ঘোর অন্যায় করিয়া ফেলেছিলাম, তার জন্য আমি সত্যসত্যই অনুতপ্ত। তিনি তো আমারই জন্য বলেছিলেন,—কিন্তু আমি অনেক ভেবে দেখলাম যে জমীদারির অংশ নিয়ে ভাইয়েদের সঙ্গে চিরকাল পুরুষানুক্রমিক বিবাদের বীজ পুঁতে রাখার চেয়ে, আমার জন্য অন্য সহজ পথ অনেক খোলা আছে। জ্যেঠামশাই! আমি বলতে এসেছি এ সম্পত্তিতে আমার কোন দাবী নাই, ওসব দাদা ও শশীর থাক। আমি যেন আপনার স্নেহ হ'তে কখনও বঞ্চিত হই না আমার এই ভিক্ষা। আমার নিজের যে কর্ম্মজীবন আমি লাভ করেছি, আমার সেই পর্য্যাপ্ত! এখন আজ আমাদের ক'ভাইকে প্রতিজ্ঞা করতে অনুমতি দিন, আমরা যেন সর্ব্বগ্রাসিনী সর্ব্বনাশিনী মোকর্দ্দমা মামলার জালে ভাইকে জড়ানই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলে মনে না করি। আপনাকেও আজ আমাদের সম্মিলনীতে উপস্থিত থেকে এক সঙ্গে আপনার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের উদ্দেশে ও এই মহা আশীর্ব্বাদ করতে হবে।"

কৃষ্ণদয়াল অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, একবার চশমার মধ্য হইতে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার আগ্রহপূর্ণ মুখখানার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, তারপর সহসা দুই হাত দিয়া তাহাকে বক্ষের কাছে টানিয়া অশ্রুজড়িত রুদ্ধপ্রায় স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মিহির, মিহির, তোর নীচ অর্থপিশাচ জ্যেঠাকে তুই আজ কি শিক্ষা দিলি রে? তোদের নিজের জিনিষ আপনি তো দিতে পারিনি, রাজার ন্যায় বিচারে ফিরে পেয়েছিস তা ও প্রাণে সহ্য হচ্ছিল না! মিহির, বাবা আজ আমার লোভ ঘুচেছে, তোর ধন তুই চিরজীবী হয়ে ভোগ কর।" মিহির নত মুখে কহিল "জ্যেঠামশাই আমায় ক্ষমা করুন, আমি বেশ আছি, পিতৃ আদেশ তো পালন করেছি, আর কেন?"

কৃষ্ণদয়াল সাশ্রুনেত্রে হাসিয়া বলিলেন, "আমার আদেশ পালন কর, আমি তো তোর বাবারও বড় ভাই।" মিহির আবার জ্যেষ্ঠতাতের পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞার সহিত মস্তকে ধারণ করিল।

সেদিন সকলে সম্মিলনী-সভার তরুণ সভাপতির পরিবর্ত্তে এক পক্ককেশ ও বার্দ্ধক্যনমিত দেহ বৃদ্ধকে তাহার স্থলাধিকার করিতে দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। সেদিন জমীদার কৃষ্ণদয়াল তাঁহার উত্তরাধিকারী ও প্রজাবর্গকে সম্বোধন করিয়া অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় ভ্রাতৃবিবাদের ফল সম্বন্ধে একটি উপদেশ প্রদান করিয়া সম্মিলিত পুত্রত্রয়কে চির সম্মিলন বদ্ধ থাকিতে আদেশ ও সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রাত্রে মিহির বহুমূল্য হীরার বালা স্ত্রীর হাতে পরাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেমন অনি, মিত্তির বংশের বউ এ বালা পর্‌তে পারে কি ?"

অন্নপূর্ণা তাহার সুকোমল হাতখানি ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিল, "না, এ জিনিষ আমাদের স্পর্শেরও যোগ্য নয়,—নাও তোমার বালা। কালই তুমি এ বালা সেকরাকে ফিরে দিও, আর আমায় আশীর্ব্বাদ করো—এই শাঁখা পরা হাতে যেন চিরজীবন আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর সেবা করতে পারি। তাঁর দরিদ্র সন্তানদের বুকের রক্ত মুখের গ্রাস কাড়া হীরের আলো চোখে লাগলে মা যে বিমুখ হয়ে এ হাতের পূজো পা থেকে ঠেলে ফেলবেন !"

অতৃপ্তনেত্রে স্ত্রীর মুখে চাহিয়া চাহিয়া মিহির মুগ্ধস্বরে কহিল, "অন্নপূর্ণা ! বাংলার প্রতি গৃহে গৃহে তোমার অধিষ্ঠান হোক ! বাস্তবিক হীরের বালার চেয়ে তোমার হাতে এই রাঙ্গা শাঁখা দুগাছিই অনেক বেশি মানাচ্চে ! আর তার কারণ এ তো বিলাসিনীর হাত নয়,—"এযে দেবীর হাত !"

মুক্তি।

মজঃফরপুরে প্লেগের আবির্ভাবে সহরবাসিগণ যখন ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় আমি ডাক্তারী করিতে প্রথম মজঃফরপুরে আসি। এখানে সহরের মধ্যে অতিকষ্টে একটি ছোট খাট পরিচ্ছন্ন দ্বিতলবাটী সংগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব তাহা পরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত করিয়া জাঁকাইয়া বসিলাম। দ্বারের উপর সাইনবোর্ড শোভা পাইল Dr. R. N. Dutt." আমার নাম রমেন্দ্র নাথ দত্ত। ক্রমে ক্রমে দু'পাঁচটি বন্ধুও সংগ্রহ করিলাম; সকালে চা চুরুট ও রাত্রে পাশা ও দাবার আড্ডাটা বিলক্ষণই জমিতে লাগিল। কিন্তু প্লেগের দিনে বড় একটা কেহই ডাক্তার ডাকিতে চাহিল না; সামান্য জ্বর হইলেই প্লেগের ভয়ে দেশত্যাগ করিয়া পলায়। দেখিয়া শুনিয়া ভাবিলাম, যাত্রা'র দিনটা বোধ করি তেমন শুভ ছিল না।

প্রায় একমাস হইয়া গিয়াছে আমি মজঃফরপুরে আসিয়াছি। আজকাল শীতের ও প্লেগের দৌরাত্ম্যে বন্ধুরাও আর বড় কেহ আসে না। কাজেই আমি সম্পূর্ণরূপ নিষ্কর্ম্মা—সময় কাটান বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। শুইয়া বসিয়া দিন যাপনের কাল আমার তখনও ঠিক আসে নাই, এক তো সম্প্রতি ছাত্র জীবন হইতে বাহির হইয়াছি, দ্বিতীয়তঃ এখন পর্য্যন্ত তামাক ধরি নাই। কাজেই এমন অলসদিন যাপন অসহ্য বোধ হইতেছিল।

যখন কার্য্যাভাবে আমার বিষম অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় সহসা একদিন ঈশ্বর আমার ঘাড়ে এক বিপুল কার্য্যভার চাপাইয়া দিলেন।—কিন্তু বেশি দিনও এ ভার রহিল না। এক মেঘলার রাত্রে গরম কাপড়গুলাকে অতিকষ্টে অঙ্গচ্যুত করিয়া লেপের আশ্রয় লইবার আয়োজন করিতেছি, এমন সময় নীচে সদরদ্বারে করাঘাত করিয়া উচ্চকণ্ঠে কেহ ডাকিল, "বাবু, বাবু, ডাংদার বাবু ডেরামে হ্যায়?" আমি কোটের বোতামগুলি আঁটিয়া দিলাম, সালের কমফর্টারটা একটু ফিরাইয়া স্বস্থানে স্থাপন করিলাম। ভাবিলাম, ব্যাপার কি? এত ব্যস্ত ভাব কেন? কলেরা বুঝি? ভৃত্য, আসিয়া বলিল," বাবু এক আউরং আয়া, আপকা সাথ মুলাকাৎ করনে মাঙ্গতা।"

নীচে আসিলাম। দেখিলাম হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে এক বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়াই সে ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "জলদি চলিয়ে ডাংদার বাবু! বাবুকে বড়া জোর বোখার আগিয়া!"

সর্ব্বনাশ! জ্বর! প্লেগ নয় তো? এ শীতে এইরাত্রে প্লেগরোগী দেখিতে কে যায়? বলিলাম, "সকালে যাব, এতরাত্রে যাইতে পারিলাম না।"

কিন্তু সেই বৃদ্ধাদাসী কিছুতেই ছাড়ে না। সে আমার পা ধরিতে যায়—কাঁদিয়া ভাসাইতে থাকে, হিন্দু-স্থানী দাসীর এ'কি আশ্চর্য্য মমতা! পুনঃ পুনঃ তাহার সেই কাতর অনুরোধ কাটাইতে না পারিয়া অগত্যা আমি যাইতে স্বীকৃত হইলাম। শুনিলাম,—তাহার বহুমা ঘরে একা, আর কেহই সঙ্গে নাই। কেমন একটা দয়া হইল, ডাক্তারিতে আমি তখনও পাকা হইয়া উঠিতে পারি নাই!

ক্ষুদ্র একতালা খাপরার ঘর। মিটমিটে প্রদীপের আলোয় আমি দেখিলাম, একপাশে একটি খাটিয়ার উপর একব্যক্তি লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন করিয়া আছে, আর তাহার পায়ের কাছে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া একটি রমণী নীথর হইয়া বসিয়াছিল। আমি আসিতে সে উঠিয়া

দাঁড়াইল। আমি দাসীকে আলো ধরিতে বলিয়া সন্তর্পণে রোগীকে স্পর্শ করিলাম। উঃ গায়ের কি উত্তাপ! বহুক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, দাসীর দ্বারা তাহার স্ত্রীকে সমস্ত লক্ষণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম,—নিঃসন্দেহ প্লেগ।

আমি উঠিয়া বাহিরে আসিলাম, দাসীর দ্বারা কাগজ কলম চাহিয়া লইয়া দু খানা প্রেসক্রিপসন লিখিয়া তাহাকে আমার ডিসপেনসারি হইতে ঔষধ আনিতে বলিয়া আবার ঘরের মধ্যে আসিলাম। রমণীকে বলিলাম, "ঔষধ আসিলে একঘণ্টা অন্তর খাওয়াইয়া দিবেন। টিনচার গলায় কর্ণ মূলে খুব সাবধানে লাগাইতে হইবে। লাগান হইলে বেশ করিয়া সাবান জলে হাত ধুইয়া ফেলা আবশ্যক। আমি এখন চল্লেম।"

স্ত্রীলোকটি দ্রুতপদে আমার কাছে আসিয়া সকাতর ত্বরিৎ স্বরে বলিয়া উঠিল, "রাত্রিটা আজ থাকুন, আমি যে বড় বিপন্ন।"

একি! এ' কার স্বর!—না আমারই ভুল!

আমি প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলাম, "আমি কি করিয়া এখানে থাকি? সে হয় না। তবে কাল সকালে আবার আসিব স্বীকার করে যাচ্ছি ভয় করবেন না, ভগবানকে স্মরণ করুণ, প্লেগ ভাল যে হয় না তা ও তো নয়।"

"এঁসা! ওঁর তবে প্লেগই হয়েছে?" এই বলিয়া রমণী মাটিতে বসিয়া পড়িল। তারপরই আমার পা দুইটা সবলে জড়াইয়া ধরিয়া কাতর কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "ডাক্তার বাবু! আপনার পায়ে ধরি আমায় এ বিপদ হতে উদ্ধার করুন। আমার স্বামীকে বাঁচান। আমার এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।"

বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আমি নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। তারপর ধীরে ধীরে তাহার হস্ত হইতে পদদ্বয় মুক্ত করিয়া লইয়া কম্পিত স্বরে বলিলাম,

"সরলা, তুমি! তোমার আজ এ অবস্থা! ওঠো, আমি এইখানে থেকে যথাশক্তি তোমার স্বামীর শুশ্রূষা করবো।"

পরদিন প্রত্যুষে আমার বাসা হইতে পরিষ্কার বিছানা, পর্দ্দা, গরম কাপড় আনাইয়া রোগীর মলিন বস্ত্র সকল পরিবর্ত্তন করিয়া দিলাম। সিভিল সার্জ্জনকে আনিয়া দেখাইলাম! আমার যতদূর সাধ্য তাহা আমি করিলাম। কিন্তু কিছুতেই বিপিনবাবু বাঁচিলেন না। সন্ধ্যাকালে তাঁহার যাতনাক্লিষ্ট দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণবায়ু অনন্ত বায়ুতে মিশিয়া গেল।

আমি দূরে সরিয়া দাঁড়াইলাম। সরলা তাহা বুঝিতে পারিল, সে নিঃশব্দে স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল। কাঁদিল না, শব্দ করিল না, এমন কি মূর্চ্ছিতও হইল না। হায়! অভাগিনী আজ একেবারেই অনাথিনী হইল।

সরলা কে? তাহার একটু পূর্ব্ব-ইতিহাস এইস্থলে বলা আবশ্যক। আমার বয়স যখন দশ বৎসর এবং সরলার চার, তখন হইতে আমাদের বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল। সরলা গরীবের মেয়ে, আমি বড়লোকের ছেলে। তথাপি এ বিবাহে আমাদের অভিভাবকদের অমত ছিল না। তাহার কারণ সরলার অতুলনীয় রূপ!

মা বলিতেন, এমন মেয়ে আর "ভূভারতে কোথাও নাই! রাজকন্যা পেলেও আমি এ মেয়ে ছাড়বো না।"

সরলা ছোট বেলা আমায় তার খেলা ঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া ধূলার ভাত ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাওয়াইত। আমি তাহাকে জলছবি পুঁতির মালা কিনিয়া দিতাম, সে সকলকে দেখাইয়া বলিয়া বেড়াইত "বর দিয়েচে।"

ক্রমে আমি বড় হইলাম। এফ, এ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে পড়িতে গেলাম। তখন ও জানিতাম না, সুখের স্বপ্ন এমন করিয়া

ভাঙ্গিয়া যাইবে! পূজার সময় বাড়ী আসিলাম, কত আশা লইয়াই আসিয়াছিলাম। কিন্তু আসিয়াই সকল আশার সমাধী হইয়া গেল। শুনিলাম যক্ষ্মাকাশে সরলার বাপ মারা গিয়াছেন। আমার পিতা একেবারেই বাঁকিয়া বসিলেন, বলিলেন, "যে বংশে এমন কঠিন রোগ আছে, সে বংশের মেয়ে কি করিয়া লই।"

মা প্রথমে একটু আধটু আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে পিতার কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই বুঝিলেন। সরলার মা এসব কথা শুনিলেন, শুনিয়া অনাথা একেবারে চারিদিক শূন্য দেখিলেন!

আমি আর কি করিব? কঠোর অধ্যয়নের মধ্যে সরলার স্মৃতি বিসর্জ্জন দিলাম। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল।

শুনিয়াছিলাম, একজন বিপত্নীক প্রৌঢ় সরলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি পশ্চিমাঞ্চলে কোথায় নাকি কি কর্ম্ম করেন। আমি সরলাকে আর দেখি নাই। তাহার পর এই সাক্ষাৎ। আমার পিতা সরলার বিবাহের সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন,—শুনিয়াছিলাম,—সরলার মা তাহা গ্রহণ করেন নাই।

নির্বান্ধব বিপিনচন্দ্র ঘোষ পোষ্টাফিসে ৩০ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। সরলারও এ সংসারে কেহ নাই। সরলার মা কয় বৎসর হইল মারা গিয়াছেন। সংসারে সরলা আজ একা অসহায়া! সে আজ কোথায় দাঁড়াইবে?

ভগবান্! এ কি হইল? সেই সরলা! সে আজ অনাথিনী, আর আমার ঘরে তো ঐশ্বর্য্যের কোন অভাবই নাই, তবু আমি তাহাকে একটু আশ্রয় দিতেও পারিব না। আমি কেমন করিয়া ইহা সহ্য করিব? সরলার এই অবস্থা চোখে দেখিয়া আমি কেমন করিয়া নিতান্ত অপরিচিত পরের মত চুপ করিয়া থাকিব?

পরদিন খুব প্রত্যুষে উঠিয়া আমি সরলার কাছে গেলাম। সরলার ক্ষুদ্র কুটীর শূন্য! মাটির মেজের উপরে সরলা নীরবে পড়িয়া আছে।

বৃদ্ধা দাসী তাহাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার অশ্রুহীন নীরব শোকের সান্ত্বনা খুঁজিয়া না পাইয়া আপনিই কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। রাত্রে আমার লোক জনেরা অনেক কষ্টে লোক সংগ্রহ করিয়া মৃতের দাহ কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছিল। সরলাকেও অবশ্য করণীয় কার্য্যানুরোধে তাহাদের সঙ্গে যাইতে হইয়াছিল। আমি কাছে যাইতে পারি নাই, দূরে বসিয়া ছিলাম। আমি গিয়া সাশ্রুনেত্রে সরলার কাছে বসিলাম। কি যে বলিব কিছুই যেন গুছাইয়া লইতে পারি না, অল্পক্ষণ নীরবে থাকিয়া ডাকিলাম, 'সরলা'!

সরলা মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিল। বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিল, "তুমি আমার জন্য অনেক করেছ। কিন্তু আর কেন? এ বাড়ীতে আর এসোনা। প্লেগ যে বাড়ীতে হয় সে বাড়ীতে অন্যের আসা উচিত নয়,—শুনেচি তার মাটি খারাপ হয়ে যায়। তুমি যাও।"

আমি বলিলাম, "যাচ্চি সরলা, আমার সঙ্গে তুমিও চলো। এখানে একা কি ক'রে তুমি থাক্‌বে? সে তো হবে না।"

সরলা চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল, পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবো?"

আমি বলিলাম, "কেন, আমার বাড়ী।"

সরলা অনেকক্ষণ কি ভাবিল, তাহার পর সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে সে উঠিয়া বসিল, বলিল, "তাই যাই চলো। বৌদিদির সেবা কর্ব্বো, তাঁর দাসী হয়ে থাকবো, তা ভিন্ন আমার তো আর কেউ কোথাও নেই।"

এইবার সরলার চোখ দিয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল।

কম্পিত স্বরে আমি বলিলাম, "সরলা, বৌদিদি কাকে তুমি বোলচো ?"

সে উত্তর করিল, "কেন, আপনার স্ত্রী।"

আমি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে কহিলাম, "আমিতো বিয়ে করিনি।"

সরলা মুখ ফিরাইয়া লইল। আমি সেখান হইতে উঠিয়া গেলাম। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, "সরলা এখন আমার বাসায় চলো। এইমাত্র তোমার বাড়ীওয়ালা এসে ছিল, আমি তাকে,—"

সরলা ব্যগ্র ভাবে বলিল, "আমার বালা দুটো বিক্রী করে কমাসের বাকি ভাড়াই চুকিয়ে দাও, যেন আমায় এক্ষনি ওঠায় না।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি, তুমি কি এখানে থাকবে ? আমার বাসায় যাবে না ?"

সরলা তাহার অলঙ্কারহীন হাত দুটি যোড় করিয়া সাশ্রুনেত্রে উত্তর করিল, "আমার এ অকৃতজ্ঞতা মাপ করো।"

"যাবেনা কেন সরলা ?"

সে সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "তুমি দেশে যাবার সময় দয়া করে আমায় সঙ্গে নিয়ে যেও, দেশে কা'র বাড়ী দাসী হয়ে থাকবো, এখন না।"

আমি এ কথায় মনে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলাম, থাকিতে না পারিয়াই সবিষাদে বলিয়া উঠিলাম, "কি বলচো সরলা, পরের দাসী-গিরি কেন কর্ত্তে যাবে তুমি ? আমার সঙ্গে এসো, ভাই যেমন স্নেহে যত্নে অসহায়া বোনকে আশ্রয় দেয়, আমি তেমনি করেই তোমায় রক্ষা করবো, এমন অসহায় অবস্থায় আমি তোমায় কোন মতেই ফেলে রাখতে পারি না।"

সরলা দৃঢ়স্বরে বলিল, "যতদিন তুমি বিয়ে না করবে ততদিন আমি তোমার বাড়ী গিয়ে থাকতে পারি না, তুমি বাড়ী যাও। যদি

আমার দুঃখ দেখে যথার্থ দুঃখিত হ'য়ে থাক,—আমায় যদি তুমি যথার্থই আশ্রয় দিতে ইচ্ছুক হ'য়ে থাক,—তবে যত শীঘ্র সম্ভব আগে ঘরের লক্ষ্মী নিয়ে এসো, তারপর এ অলক্ষ্মীকে স্থান দিতে চেও,—এখন না।"

সরলার এ অনধিকার আবদারে ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলাম, "বিবাহ আমি করি না করি সেজন্য তোমার ব্যস্ত হবার এখন দরকার দেখি না, এ বাড়ীতে প্লেগরোগী মারা গেছে, আমি ডাক্তার—আমি তোমায় এখানে থাকতে দেবো না।"

শুনিয়া সরলা একটু হাসিল, সে কি হাসি! সে যদি হাসি হয় তবে সে হাসি আকাশের মেঘের সেই বহ্নিশিখা বিদ্যুতের হাসিরই মত। সে দৃঢ় কণ্ঠে কহিল "আমার যদি তোমার জন্য 'ব্যস্ত হবার দরকার না' থাকে,—তবে তোমারও আমার জন্য ব্যস্ত হইয়া কাজ নাই,—তুমি যাও।"

তাহার মায়ের কথা মনে পড়িল, বুঝিলাম সঙ্কল্প অটল। দুঃখিত চিত্তে ফিরিয়া আসিলাম।

বড় বিপদেই আমি পড়িয়াছি! এই অনাথিনীকে কেমন করিয়াই বা একলা ফেলিয়া রাখি, আর কেমন করিয়াই বা এই সুন্দরী যুবতীকে তাহার অনিচ্ছায় গৃহে আনি? সে যে কেন আসিতে চাহে না সে কি আর আমিই বুঝিতে পারিতেছিনা! লোকাপবাদ জিনিষটা খুবই তুচ্ছ নয়। তাহার কিছু মূল্যও তো আছে,—বিশেষ স্ত্রীলোকের পক্ষে। হা অদৃষ্ট! সরলাকে কোথা হইতে আমার মাঝখানে টানিয়া আনিলে? আমি এখন কি করি?"

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়াই আবার সরলার কাছে গেলাম। আজ দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াই গিয়াছিলাম। যেমন করিয়া হয় তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবই। সে এখানে থাকিতে না চাহে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া দেশে যাইব এবং সেখানে আমাদের দেশের বাটীতে আমার জ্ঞাতি খুড়া মহাশয়ের গৃহে তাহার ভরণ পোষণের ভার লইয়া খুড়িমার নিকট তাহাকে

রাখিয়া আসিব। দ্বারে গাড়ী রাখিয়া আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলাম, "সরলা!"

কেহ উত্তর দিল না। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সরলা মাটির উপর চুপ করিয়া শুইয়া আছে।

আমার পদ শব্দে সরলা মাথা তুলিয়া বলিল, "এসেছ?" আমি কাছে গিয়া চমকিয়া উঠিলাম, "এ কি সরলা? কি হয়েচে?"

সরলা কষ্টের সহিত হাসিয়া ক্ষীণস্বরে উত্তর দিল," বড় সুখের দিন এসেছে ভাই, আজ বড় সুখের দিন এসেছে! আমার ভাগ্যে যে এত সুখ লেখা ছিল তা স্বপ্নেও কখন জানতেম না। আশীর্ব্বাদ করো মরে যেন স্বামীর কাছে যেতে পাই; যেন তাঁরই পদ সেবা করতে পারি। তুমি সুখী হও।"

"সরলা! সরলা! কেন কাল আমার সঙ্গে গেলে না? এই হলো, শেষে আমায় এই দেখতে হোল?" আমি এবার কাঁদিয়া ফেলিলাম। বুঝিতে পারিয়াছিলাম সরলারও প্লেগ হইয়াছে।

সরলা আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। সেই বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক অথচ তীব্র বিকাশটুকু সামান্য একটা তুচ্ছ আলো মাত্র নয়, মহান একটা শক্তিও তাহার মধ্যে লুকান আছে।

সরলা মৃদু হাসিয়া কহিল, "কেন অত অধীর হোচ্চ? আমার ত আজ মুক্তি! তোমারও আজ সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেক জ্বালা থেকেই মুক্তি।"

আমি তৎক্ষণাৎ সিবিল সার্জ্জনকে লইয়া আসিলাম। তিনি দেখিয়াই বলিলেন "প্লেগ, রোগীর বাঁচা কঠিন।"

আমি সমস্তদিন অবিশ্রান্ত যত্ন চেষ্টা করিয়াও তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। গভীর রাত্রে একটু সুস্থ হইয়া সরলা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "বলো আমার শেষ অনুরোধ রাখবে?" আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, "কি বল্‌বে বলো সরলা, রাখবার মত হলেই রাখবো।"

সে বলিল, "তুমি বিয়ে করবে আমার কাছে স্বীকার করো?"

আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। আমি আর যাই করি, এ সময়ে তাহাকে বঞ্চনা করিতে পারিব না।

তখন সরলা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চোখ মুদিল। আমার নিকট উত্তর পাইবে সে ভরসা তাহার বোধ করি হইল না, তবে সে যে আমায় তাহার ভার হইতে মুক্তি দিয়া গেল,—এই আনন্দেই শুধু একটু খুসী হইয়া—অনেকখানি নিশ্চিন্ত চিত্তেই যাইতে পারিয়াছিল, তাহা তাহার মুখ দেখিলেই বুঝা যায়।

অকৃতজ্ঞা।

(১)

মাতৃহীনা হইয়া লীলা দেখিল, সে সহসা এক বৃহৎ জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম কয়দিন এলোচুলে ধুলায় পড়িয়া সে দিন রাত বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়া বাড়ীর ও পাড়ার লোকের চোখের জল মুছিতে অবসর দেয় নাই। কিন্তু প্রথম শোকোচ্ছ্বাস প্রশমিত হইলে সে দেখিল,—আর তাহার ছেলেমানুষের মত বসিয়া শুধু কাঁদিলে চলিবে না। গৃহিনীশূন্য গৃহস্থালী তাহার বিরাট শূন্যতা লইয়া দীনচক্ষে যেন তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। লীলা প্রথম স্নেহাকাঙ্ক্ষী শিশুর মত দিন উঠিয়াই তাহার বাপের পানে চাহিয়া দেখিল সেই স্তব্ধ গম্ভীর মুখে একটা নিবিড় অন্ধকার শোকের ছায়া যেন বেশ করিয়া মৌরসীপাট্টা লইয়াছে। মুখের সেই যে একটা কেমন সদানন্দ-ভাব,—যাহাতে তাঁহার নিজের ছেলে মেয়ে হইতে বিচারক্ষেত্রে আসামী ফরিয়াদি পর্য্যন্ত সকলকে প্রশ্রয় দান করিত—হঠাৎ আজ লীলা দেখিল, বর্ষার মেঘে যেমন করিয়া আকাশের চাঁদকে ঢাকে, তেমনি করিয়া একখানা ঘন বিষাদ মেঘে তাঁহার সে প্রফুল্লতা ঢাকিয়া দিয়াছে।

লীলা বুঝিল;—এ ঝড়টা তাহার পিতাকেই বেশী করিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে দুই হাতে পিতার কপোল লগ্ন হাতটা টানিয়া লইয়া ডাকিল "বাবা!" সে আহ্বানে চমকিত হইয়া হরেন্দ্রনাথ কন্যার দিকে চাহিলেন, "কি মা?"

কোন কথা বলিবার ছিল না। একটা হৃদয়ভেদী ক্রন্দনে বালিকার বুক কাটিয়া উঠিতেছিল। সে পিতারর দিকে মুখচোহিয়া কাঁদিয়া

উঠিল। পিতা সাশ্রুনেত্রে কন্যাকে বুকে টানিয়া লইলেন, কেহ কোন কথা বলিল না।

বহুক্ষণ কাঁদিয়া লীলা এক সময় চোক তুলিয়া দেখিল তাহার পিতার চোখের কোলে দুইবিন্দু জল গড়াইয়া পড়িতেছে। সে বলিল, "আমাদের কি হ'লো বাবা ?"

পিতা উত্তর করিলেন, "ঈশ্বরের যা ইচ্ছা ছিল !"

(২)

মা থাকিতে লীলার বাপের বড় একটা তাহার সাহচর্য্য প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখন লীলা দেখিল তাহার সঙ্গ ভিন্ন তাহার পিতার যেন আর চলিবার 'যো' নাই। লীলার সব সময়টুকু তিনিই যেন অধিকার করিয়া লইয়াছেন! তাঁহার স্নানের সময় লীলা গরম ঠাণ্ডা জলে মিশ খাইয়াছে কিনা দেখিয়া দিবে, ভোজন কালে মাছি তাড়াইবে, শয়নকালে মাথা টিপিয়া দিবে। আবার ঘুম না হইলে গল্প করিয়া সময় কাটাইয়া দিবে। বস্তুত লীলা না হইলে তাঁহার কার্য্যহীন অবসর কাল কাটাইবার আর কোন উপায়ই ছিল না। যাঁহার রোগ শুশ্রূষার জন্য ছুটী—তিনি নাই, কিন্তু এখনও তিন মাস ছুটী বাকী আছে। সময় বুঝি কাটে না, অথচ কাজে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছাও নাই! কিন্তু লীলা যখন পিতাকে স্বহস্তে জব জবে করিয়া তেল মাখাইয়া, ঠাকুরকে চাপিয়া চাপিয়া ভাত বাড়িতে বলিয়া, গোয়ালিনীকে জলদেওয়া দুধ দেওয়ার জন্য ধমক দিয়া তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট, মাতৃপ্রদর্শিত পথে শত চেষ্টাতেও পিতার ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরানয়ন করিতে পারিল না, তখন সে নিতান্ত হতাশ হইয়া একদিন পিতাকে বলিল, "বাবা তুমি কেন এত রোগা হ'য়ে যাচ্ছো, বলো না ?" এ প্রশ্নের উত্তর দিবার শক্তি তাহার পিতার ছিল না। তিনি শুষ্ক হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কই না মা, রোগা তো হইনি।" কিন্তু ইহাতে লীলা সন্তুষ্ট হইল না। সে তাঁহার গলার কণ্ঠায় হাত দিয়া দেখিতে

দেখিতে বলিল, "না বই কি! এই দেখ দেখিনি তোমার গলায় হাড় দেখা যাচ্ছে! তুমি কিচ্ছু খেতে পারো না, তুমি ওষুধ খাও বাবা! না হলে হয় ত তোমার অসুখ করবে।"

পিতা কন্যার এ সভয় অনুরোধে মর্ম্মে আঘাত পাইলেন। এক জনের কাছে যে প্রতারিত হইয়াছে বুঝি সকলকেই তাহার অবিশ্বাস! হাসিয়া বলিলেন, "না মা অসুখ করবে না, ঠাকুর ভাল রাঁধে না, তাই খেতে ভাল লাগে না।" লীলা বিজ্ঞভাবে বলিয়া উঠিল, "ওঃ তাই হবে!"

পরদিন সকালে হরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন আজ একটা কিছু কাজে লীলা বড় ব্যস্ত আছে। সকালের সময় আর কাটে না! লীলা আজ তাঁহাকে জল খাওয়াইয়া সেই চলিয়া গিয়াছে আর সে একবারও আসে নাই। হরেন্দ্রনাথ বাড়ীতে লীলাকে না পাইয়া রান্নাঘরে তাহাকে খুঁজিতে গেলেন। গিয়া দেখিলেন,—ভিজাচুল জড়াইয়া কোমরে কাপড় বাঁধিয়া কাঠের ধোঁয়ায় মুখচোখ লাল করিয়া সে একমনে কড়ায় কি ভাজিতেছে। পিতাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কড়াটা উনান হইতে নামাইয়া ফেলিয়া উঠিয়া আসিল; কোমর হইতে আঁচল খুলিয়া গায়ে ঢাকা দিয়া অনুযোগের ভাবে বলিয়া উঠিল, "এই ধোঁয়ায় তুমি কেন এলে বাবা, তোমার যদি মাথা ধরে! ওমা! তুমি রোদে দাঁড়িয়ে রয়েছ! বাবা, তুমি এমনি করে অসুখে পড়বে!" তাহার মা তাহাকে যাহাই বলিতেন, সে সেই সবগুলিই তাহার সেই স্নেহপালিত সন্তানটীর উপর প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য মনে করিত। সে যেন আজ কাল এই শোকজীর্ণ প্রৌঢ়ের জননী হইয়া উঠিয়াছিল। মাতৃহীনা বালিকা—তাহার যাহা কিছু সঞ্চয় ছিল, সবটুকু স্নেহ মায়া ভক্তি প্রীতির ধারাই যে একমাত্র সংসারের ভরসা এই পিতার উপরেই ঢালিয়া দিয়াছিল! পক্ষিণী যেমন পক্ষপুটে তাহার ক্ষুদ্র সন্তানটীকে ঢাকিয়া রাখে, বালিকা তাহার পিতাকে তেমনি করিয়া তাহার ক্ষুদ্র চিত্তের সমস্ত আগ্রহ আশঙ্কার তলে

লুকাইয়া রাখিতে চাহিত। ভৎসিত হরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তুই এ কি করছিস মা? এ আবার তোর কি ঝোঁক চেপেছে? ঠাকুর কোথায় গেল?"

"তুমি যে ঠাকুরের রান্না খেতে পারো না বাবা! মা যে তাই নিজে রোজ কত কি রেঁধে দিতেন। আমি তো ভাল জানি নে, মার পাকপ্রণালীখানা দেখে দেখে তাই রাঁধতে শিখচি।"

"আচ্ছা শেখ, শেখ, কিন্তু তোর বান্নার যে সময় কাটে না লীলা!"

লীলার মুখ একথায় বিষন্ন হইয়া গেল। তারপর সে অনেক ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা বাবা কালথেকে তোলা উনুনে বাইরে রাঁধবো, তুমিও তাহলে রান্নার সময় সেখানে থাক্‌তে পারবে, সে বেশ হবে না?"

হরেন্দ্রনাথ এ প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন।

(৩)

কিছুদিন পরে লীলা বুঝিল তাহার সব চেষ্টাই বৃথা হইতেছে। কাছারী খোলার পর হইতে তাহার পিতার শরীর যেন আরও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সে বড় ভয় পাইয়া কলিকাতায় হিন্দুহোষ্টেলে তাহার দাদাকে পত্র লিখিল, "বাবার অসুখ করিবে, আমার ভয় করিতেছে, তুমি শীঘ্র এসো।"

বিনয় পিতাকে পত্রে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে হরেন্দ্রনাথ লিখিলেন "ও কিছু না, পাগলীর পাগলামী।" লীলা শুনিয়া রাগ করিয়া বলিল, "তা বই কি! তুমি আর্শীতে দেখ দেখিন, দিন দিন তুমি কি হ'য়ে যাচ্চো!" তাহার চিন্তা-গম্ভীর মুখ দেখিয়া তাহার পিতা উত্তর করিলেন, "তুই অত ভাবিস কেন লীলা? আমার মাথার অসুখ—জানিসতো যখন বাড়ে তখন আমার শরীর অসুস্থ হয়। যা তোর বই নিয়ে আয়, আজ ঋজুপাঠটা শেষ হবে না?" "তা যাচ্চি বাবা, কিন্তু তুমি কিছু ওষুধ টষুধ খাও, ও বাবা, না অমন করে থেকো না!"

সস্নেহে ভীতা বালিকাকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় হাত

বুলাইতে বুলাইতে স্নেহময় পিতা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আচ্ছারে পাগলী তাই হবে। এমন পাগলী মায়ের হাতেও পড়িচি।"

কবিরাজ ডাকাইয়া সে পিতার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা লইল, ঔষধ পথ্য সেবনও যথাসাধ্য করাইতে ত্রুটী করিল না, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। বালিকা হইলেও লীলা এবার বুঝিল, তাঁহার এ ক্ষত সারাইবার ঔষধ তাহার বা অপর কোন বৈদ্যের ভাণ্ডারেও নাই। এ আঘাত যে বড়ই গুরুতর।

(৪)

লীলাকে তো আর চিরকাল আইবুড় রাখা যায় না, তাহার বিবাহ দিতেই হইবে। হরেন্দ্রনাথের ইচ্ছা একটী গরীবের ঘরের ভাল ছেলে দেখিয়া ঘরজামাই রাখা। কিন্তু বন্ধুবান্ধবেরাও বারণ করিতেছেন আর বিনয়েরও ইহাতে ঘোর আপত্তি। শেষ সংসারের গতি বুঝিয়াই অনারে বি এ পাশ করা এক সবরেজিষ্টার-পুত্র সুকুমারের সহিতই লীলার বিবাহ স্থির করিলেন। এ বিবাহে হরেন্দ্রনাথের আত্মীয়েরা মহা সুখী হইলেও পিতা কন্যা ইহাতে মহা অসুখী। লীলা ভাবিতেছে, "বাবাকে ছেড়ে আমি কি ক'রে থাকবো?" হরেন্দ্রনাথ ভাবিতেছেন, "বিয়ে হলে কি তারা আর তাদের বউ পাঠাবে? লীলা ছাড়া আমার আর কে আছে?"

যথাকালে বিবাহ হইয়া গেল। চোখের জলে বারাণসীর আঁচল ভিজাইয়া, গালের চন্দন-চিত্র ভাসাইয়া, মুখ চোখ লাল করিয়া লীলা শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গেল। বৌ দেখিয়া সকলে বলিল, "বাবা এ যে সাত ছেলের মা মাগি, এ'কি ক'নে বৌ গো! সহরে সবি সাজে, একি আমাদের পাড়াগাঁ!" তবে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল যে, বধূ যেমনি হোক? বধূর পিতা বড়লোক বটে! মেয়ের হাতে চুড়িই তিন জোড়া! মাথায় গলায় খোঁপায় কাণে ও মেয়ের হাতে পায়ে কত রকমেরই গহনা! খাট বিছানা দানসামগ্রী সবই ভাল, নমস্কারীতে জনে জনে পার্শীসাড়ী, সিল্কের জ্যাকেট আরও কত কি! এমন দেওয়া কেউ দেয় না।"

শাশুড়ী বলিলেন, "আমার স্থকুর বৌ যেমনি কেন হোক না তার মনে ধরিলেই হইল। আমার আর পছন্দ অপছন্দ কি? তবে বড় যে রূপের কথা শোনা গিয়েছেলো কি না,—তাই এক কথা বলতে হয়, না হলে আর কি? বউয়ের রং তো তেমন বিবিদের মতন নয়—ও রং মাজা ঘষা, আওতার গাছের মতন, তা হোক—মুখছিরিটুকু আছে। চুলটুকুনও দিব্যি! তবে বাবু তা-ও বলি;—মুখের মধ্যে একটু 'নয়ন-থাল'—চুলও কোঁকড়া নয়। একটু যেন কাহিল কাহিল—হোক, তবু গড়নটা নেহাৎ কাট কাট নয়। বউএর চটক আছে।"

ফুলশয্যার রাত্রে ফুলের বিছানা যখন কণ্টকাকীর্ণ ও বাতির আলোক যখন দাহ জ্বালা আনিতেছিল,—তখন লীলা প্রথম স্বামী সম্ভাষণ লাভ করিল। সে চোখ মুদিয়া বিছানার এক পাশে শুইয়াছিল। স্থকুমার খাটের উপর উঠিয়া বসিল। বহুক্ষণ লীলার অবগুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে ডাকিল "লীলা!" লীলা এ অপরিচিত সম্বোধনে চমকিয়া উঠিল, উত্তর দিল না। তখন লীলার কাছে আসিয়া তাহার মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিয়া স্থকুমার নববিবাহিতা পত্নীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। অশ্রুপরিপ্লুত শান্তদৃষ্টি, স্থন্দর সরল মুখ! স্থকুমার সাদরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সর্ব্বদা অত কাঁদ কেন লীলা?" এই কথায় লীলার চক্ষের জল অধিকতর বেগে প্রবাহিত হইল। স্থকুমার দুটি একটি মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া সে কান্না থামাইতে না পারিয়া শেষে বিশেষ একটু বিরক্ত হইয়াই বলিল, "তুমি কেন যে অত চব্বিশ ঘণ্টাই কাঁদ, তা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। দুদিন পরে বাপের বাড়ী যাবেই ত জান। তোমার কি এখানে বড্ড কষ্ট হয়? বলো চুপ করে থেকো না। খুব কষ্ট হয়?"

লীলা এ কথাটার নিগূঢ় অর্থ না বুঝিয়া সরল ভাবেই মস্তক হেলাইয়া জানাইল,— "হয়।" স্থকুমারের চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ক্ষোভের

সহিত সে বলিল, "তা হবেই তো!" মনে মনে ভাবিল, "আমরা গরীব তাই লীলা আমাদের বাড়ী থাকতে কষ্ট হয় বলিল। বড় লোকের মেয়ে বলিয়া তার মনে এত গর্ব্ব!"

(৫)

বিবাহের পর লীলা দেখিল আর যেন ঠিক পূর্ব্বের অবস্থা বজায় নাই। কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হইয়া গিয়াছে। দাদা যেন তাহার প্রতি সমধিক বিরক্ত।—সে বিরক্তির কিছু নূতন কারণও আছে। লীলা তাহা জানেনা। লীলার বিবাহের দিন বিনয় পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "লীলাকে নাকি আপনি মার সব গহনা পত্র দিচ্ছেন?" হরেন্দ্রনাথ উত্তর দিয়াছিলেন "তা দিচ্চি, মার জিনিষ মেয়েই পায়।" বিস্মিত হইয়া বিনয় বলিয়া উঠিল "তা ছাড়া এদিকেও এই ছয় সাত হাজার টাকা হবে! অনর্থক অত খরচ কেন?" হরেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন "আমার ইচ্ছা!" লীলার জন্ম হইতেই বিনয় তাহার স্নেহের ভাগীদার বোনটিকে কোন দিনই বড় একটা স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতে পারে নাই। তাহার বিবাহের পর হইতে সে যেন বিশেষ করিয়া লীলাকে দুই চক্ষের বিষ দেখিয়াছে। তাহার চিরকালের বিশ্বাস বাপ তাহাকে দেখিতে পারেন না ও লীলাকে বেশী ভালবাসেন। এবার সে বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া সে পিতার সেই পক্ষপাতিতার শোধ লীলাকে দিতে চাহিল। সে কষ্ট লীলা সহজে ভুলিতে পারিতে ছিলনা। তারপর সে আরও দেখিত তার পিতা যেন আর ঠিক তেমনি তার আয়ত্তের মধ্যে নাই। এখন তাহাদের সেকেণ্ডবুক ঋজুপাঠের সরল ব্যাখ্যার মাঝখানে আর একজন সহসা আগন্তুক অপরিচিত ব্যক্তির প্রসঙ্গ কোথা হইতে আসিয়া পড়ে। লীলার মনে হইত তাহার ভাগ হইতে চুরি করিয়া লইয়া তাহার পিতা যেন সুকুমারের উপর স্নেহ ঢালিতেছেন। এ বড় অন্যায় ছিঃ!

কে কোথাকার একটা লোক, সে তাহার পিতার প্রতি একটুও মমতাশীল নয়—বরং তাঁহার সম্বন্ধে শ্লেষ ও একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষপরায়ণ বলিয়াই তাহার কথার সুরে সর্ব্বদা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তা বাবা কি দুঃখে তাহাকেই অত করিয়া ভালবাসিয়া বসিলেন? তাহার পিতার এই ব্যর্থ ভালবাসার কথা মনে করিয়া লীলার হৃদয় তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে এক দিন এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইল যে, সে বিদ্রোহ আর দমিত রহিল না।

লীলার শ্বশুরবাড়ী হইতে চিঠি আসিল, "বৌমাকে পাঠাইবেন, পরশু লোক যাইবে।"

চোখে জল ও মুখে হাসি আনিয়া হরেন্দ্রনাথ কন্যাকে বলিলেন,—"তোর এবার ডাক এসেচে মা! তুই তোর নতুন সংসারে যাবার জন্য প্রস্তুত হ' লীলা!" লীলা সব শুনিয়াছিল, সে একবার প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "কক্ষনো আমি যাবো না, এই তো সে দিন গেছলাম,—আবার!"

পিতা সকরুণ স্নেহের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কি করবি পাগলী, যেতেই হবে? সেই যে তোর ঘর, এ চিরকালের ঘর তো তোর ঘর নয় মা! তুই যে পরের জন্য জন্মেছিস্ লীলা!" এই কথাগুলায় কত সুখভরা বেদনা বিজড়িত ছিল বালিকা লীলা তাহা বুঝিলও না। সে যখন দেখিল তাহাকে বিদায় দিতে তাহার পিতা স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন সে সেই গর্ব্বিত ভাব ছাড়িয়া একেবারে কাঁদিয়া ভাসাইল; কিছুতেই সে যাইবে না, কোন মতেই না। স্নেহাতুর পিতৃহৃদয় বিকল হইয়া উঠিল। ইহার ফলে লীলাকে লইতে আসিয়া লোক ফিরিয়া গেল। তাহার ফলে সপুত্র লীলার শাশুড়ীর ক্রোধের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। দুই দিন পরে তিনি অনেক ভর্ৎসনা করিয়া নিজের জবানীতে বেহাইকে পত্র লিখাইলেন, যে, "সুকুমার প্রতিজ্ঞা

করেছে দুদিনের মধ্যে নিজে যেচে মেয়ে পাঠিয়ে দেনতো ভালই, না হলে তিন দিনের দিন সে আবার গরীবের মেয়ে দেখে বে' করবে। ও বড় মানুষের মেয়ে তাকে তোলা থাক। আমাদের গরীবের ঘরে ঘর করা বউ চাই।" পত্র পড়িয়া হরেন্দ্রনাথ শরবিদ্ধ কুরঙ্গের মত ছটফট করিয়া উঠিলেন। এ কি নির্ম্মম কথা! তাঁর বড় আদরের জামাই—লীলার স্বামী—তার এই ব্যবহার! লীলাকে এর চেয়ে জলে ফেলিয়া দেন নাই কেন? ভগবান! ভগবান! আমার লীলা যেন সুখী হয়! লীলাকে আমার অসুখী করো না?

লীলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা তুমি কি ভাবচো?" হরেন্দ্রনাথ সুদীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আর তো তোকে রাখিতে পারিনে লীলা!" লীলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উত্তর করিল, "কেন বাবা আমি কি করিছি?" হরেন্দ্রনাথ নীরবে লীলার শ্বাশুড়ীর পত্রখানা তাহার হাতে দিয়া নিজে মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন। লীলা পত্র পড়িয়া সাতঙ্কে বলিয়া উঠিল, "ও বাবা! না বাবা আমায় পাঠিও না বাবা, আমায় পাঠিও না।" মর্ম্মাহত পিতা কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "চুপ কর, চুপ কর, লীলা—আমায় কিছু বলিসনি। কিছুতেই আমি তোকে আর ধরে রাখ্‌তে পারব না মা, তোকে যেতেই হবে।" "না বাবা, আমি যাবো না। তারা আমায় বড় কষ্ট দেবে, তুমি দেখচো না কি রকম চিঠি লিখেছে! তা আমায় কষ্ট দিগকে, কিন্তু তুমি কি ক'রে থাকবে বাবা! আমিই বা তোমায় ছেড়ে কি ক'রে থাকবো? আমি যাবো না বাবা, আমি যাবো না!"

"লীলা, আমার জন্য কিছু ভাবিস্‌নে,—আমি তোর মাকে ছেড়ে যখন বেঁচে আছি, তখন তোকে ছেড়েও তোর কঠিন প্রাণ বাবা বেঁচে থাকবে। আর তুই? তুই তোর নিজের ঘরে সুখেই থাকবি মা। লীলা, মিছে আর আমায় কেঁদে কেঁদে কষ্ট দিস্‌নে মা! কালই তোকে

যেতে হবে। আমি সব উদ্যোগ করি। আমি কি কিছু জানিরে! কি সব দিতে হয় না হয়? তোর মা যদি থাকতো আজ আমাদের কত সুখের দিন!"

হরেন্দ্রনাথ জোর করিয়া 'সুখের দিন' ভাবিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু বড় দুঃখে তাঁহার হৃদয় ফাটিতেছিল। কেবলই মনে হইতেছিল তাঁহার লীলার কি এতটুকুও মূল্য নাই? কানাকড়ি বিনিময়ে কি তাঁহার এত স্নেহের লীলাকে বিক্রয় করিয়াছেন?

লীলা চলিয়া গেল। শূন্যগৃহ দ্বিগুণ শূন্যতা লইয়া আর্তভাবে হাহাকার করিতে লাগিল। হরেন্দ্রনাথ আজ সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ হইলেন। আজ তিন বৎসর ধরিয়া যে দুইটি ব্যগ্রবাহু তাঁহাকে দিন রাত্রি বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, আজ সে বাহুপাশ খুলিয়া গিয়াছে। একটী ফুলের মত স্নিগ্ধ কোমল সুবাসমণ্ডিত ব্যাকুল হৃদয় তাহার সমস্ত আগ্রহ সমস্ত করুণা লইয়া তাঁহার পানে ধ্রুবতারার মত আর নির্নিমিষে চাহিয়া নাই। যে সুধা-নির্ঝরের বিমল ধারায় তাঁহার ক্ষতজ্বালা কথঞ্চিৎ প্রশমিত ছিল, আজ সে চলিয়া গিয়াছে। এখনও কানের কাছে তাহার আকুলকণ্ঠ থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে,—"ও বাবা, বাবাগো! আমায় পাঠিও না, বাবা, আমায় পাঠিও না।" অস্থিরচিত্তে হরেন্দ্রনাথ বিনয়কে লিখিলেন, "বাবা বিনয়, তুমি এস, আমি আর পারি না!"

বড় অসহ্য কষ্টে দিন কাটিতে লাগিল। হরেন্দ্রনাথ দুই মাস পরেই লীলাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন।

(৬)

লীলা শ্বশুর বাড়ী পেঁৗছিতেই লীলার শাশুড়ী কঠিনমুখে কহিলেন, "এসেগো বড় মানুষের মেয়ে এসো! আর কখন বাপের বাড়ীমুখো হয়ো দিকিন দেখবো! বড় মানুষ বলে এত দেমাক! আমার পাঠান লোক ফিরিয়ে দিয়ে আমার অপমান করেন। শ্বশুরবাড়ী মেয়ে পাঠাতে চান

না।—ওরে ও হাবাতে মিনসে! মেয়ে যদি পাঠাবিই না, ঘরেই যদি রাখবি তো অমন ঢং দেখানে বে' দেওয়া কেন?

রাখলেই হোত ঘরে! তখন তো তোর মেয়ে কেউ আনতে যেতোনারে মুখপোড়া! এখন কেমন হলো, কই মেয়েতো আটকে রাখতে পারলেন না! সেই থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে—পায়ে ধ'রে তো দিয়ে যেতেই হলো।"

এই অভ্যর্থনা লাভ করিয়া লীলার রোদন দ্বিগুনিত হইয়া গেল। রাত্রে শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া সুকুমার দেখিলেন লীলা বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এতো বাড়াবাড়িতে আর কাজ নাই। ঢের সোহাগ কাঁড়ান হয়েচে! মনে করেছ,—কেঁদে কেটে আমাদের মন ভুলিয়ে বাপের সোহাগী মেয়ে বাপের বাড়ী সোহাগ করতে ফিরে যাবে, সে আশা মনের কোণেও তুমি আর ঠাঁই দিওনা। মিথ্যে প্যানপ্যানিয়ে কাঁদো তো ঘর থেকে এখুনি দূর ক'রে দেবো। চুপ করে শোবেতো উঠে এস!"

কি সর্ব্বনাশ! এরা সব পারে! ও বাবা! এ তুমি আমায় কোথায় পাঠালে গো, ওগো, আমায় কেন পাঠালে?

লীলা তথাপি উঠিল না দেখিয়া লীলার স্বামী দীপ নিবাইয়া নিজে গিয়া লীলার পিতৃদত্ত খাটে শয়ন করিলেন। বলিলেন,—"কান্নার এতটুকু ফোঁস্ ফোঁসানি কানে ঢুকেচে কি উঠে নড়া ধ'রে বার ক'রেচি।"

সারারাত্তি লীলা মাটিতে বসিয়া থাকিয়া কাটাইল, সুকুমার খাটে শুইয়া স্বচ্ছন্দে ঘুমাইল, আর একবার ডাকিলও না। শ্বশুরের উপর রাগ ছিল এবং স্ত্রী সেই শ্বশুরেরই জন্য এত কান্না কাটা করে সেও তাহার অসহ্য হয়। তাহাকে স্বামী পাইয়াও সে চরিতার্থ হইল না!

বউকে শাসনে না রাখিলে ক্রমে সে মাথায় চড়িয়া বসে, বউ মানুষ কুকুরের জাত, 'নাই' দিতে নাই। এই ধারণায় লীলার শাশুড়ী বধূকে

বিশেষ একটু শাসনে রাখিয়া ছিলেন। নহিলে বধূকে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া আহার করান ও স্নানের সময় বেশ করিয়া তৈলমর্দ্দন করিতেছে কি না ইহা পর্য্যবেক্ষণ করায় তাঁহার আলস্য ছিলনা। বধূর বিবিয়াণী সাজ— সেমিজ জামাজুমি অবশ্য তিনি ইত্যবসরে লীলার অঙ্গচ্যুত করিয়া অনেকটা মানসিক সাচ্ছন্দ লাভ করিয়াছিলেন। কি করিবেন? ওসব কোন ভদ্র লোকের মেয়েরা তো পরেনা। তাঁহার বধূ কি জন্য পরিবে? মাতৃহীনা সহবৎশিক্ষাবিহীনা বধূকে সহবৎ শিক্ষা দিতে অনেক কষ্টই তাঁহাকে পাইতে হইতেছিল। কিন্তু উপায় কি? ঘরের বউ তো আর ফেলিয়া দিবার নয়! এক দিন তিনি তাহাকে পশম বুনিতে দেখিয়া হরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। লুকাইয়া সে পিতার জন্য একটি কম্ফর্টার বুনিতে ছিল। তাঁহারটি যে এত দিন পুরাতন হইয়া গিয়াছে, বাড়ী যাইবার সময় এটী সে লইয়া যাইবে। বধূকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়া পুত্রকে গিয়া কহিলেন, "ও স্থকু দেখছিস একবার আমার বৌমার আক্কেলখানা! এই আমি মুখে রক্ত উঠে খেটে খেটে মরে যাচ্ছি—আর উনি আমার গুরুমা সেজে ঘরের কোণে বসে পশম বুন্‌চেন; সাধে বলি যে সহরের মেয়ে বিয়ে ক'রে কি ঝকমারীই যে তুই করিছিস! ছি ছি! ঘেন্নায় মরি না, ঘেন্নায় মরি! এতটুকু হায়া লজ্জা কি ভগবান ও শরীরে দিতে পারেন নি?"

লীলার স্বামী সুকুমারের মেজাজটা একটু বেশি রকমই কড়া, এবং মনটাও তাহার স্বভাবতঃই ঈর্ষাসন্দিগ্ধ ও নিতান্তই অনুদার। মার কথায় রাগিয়া সে লীলার উদ্দেশে গেল। দেখিল তখন সে চোখ মুছিতে মুছিতে বিছানা ঝাড়িতেছে। সুকুমার সম্মুখেই বেতের বাস্কেটে সেলায়ের দ্রব্য দেখিতে পাইল। তুলিয়া লইয়া স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, —"আর কিছু আছে?" ঘাড় নাড়িয়া লীলা জানাইল "না।" জানালার নীচেই খিড়কীর পুখুর বর্ষার জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। জানালার মধ্য দিয়া

লীলার সাধের জিনিষগুলি সে দৃঢ় হস্তে ফেলিয়া দিল। লীলা মুখ ফিরাইয়া ঘরের অন্য পার্শ্বে চলিয়া গেল। তারপর সুকুমার টেবিলের উপরে সাজান—তাহার খেলনা পাতি, সুগন্ধি তৈল, এসেন্সের শিশি প্রভৃতি তুলিয়া লইবামাত্র লীলা ফিরিয়া দেখিল। সুকুমার বলিল, "গেরস্থ ঘরের বৌ এত সৌখীন হ'লেতো আর চলে না,: সব সৌখীনতা তোমার এই এম্‌নি ক'রে ছাড়াচ্ছি দেখনা।—বড় মানুষের মেয়ে বলে বড় নবাবী ?"

লীলা হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল,—"ফেলে দেবে ? বাবার দেওয়া জিনিষগুলি—তা দাও।" অচঞ্চলভাবে সে তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া গেল। তারপর সুকুমার চলিয়া গেলে পুনশ্চ ঘরে আসিয়া নিজের যেখানে যাহা কিছু সৌখীন দ্রব্য ছিল, সমস্ত বাহির করিয়া একে একে জানালা দিয়া নিজের হাতে জলে ফেলিয়া দিল।

দোয়াত, কলম, কাগজ, খাম একে একে সবই গেল। বাপের বাড়ীতে চিঠি লিখিবার অধিকার তো ছিলই না,—সে এখানে আসার দ্বিতীয় দিনেই বাক্সের চাবি খুলিয়া সুকুমার তন্মধ্যস্থ টিকিট ও টাকাগুলি বাহির করিয়া নিজের নিকট আমানত রাখিয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন,— মেয়েমানুষ চিঠি লিখিতে পাইলে যাহাকে তাহাকে চিঠি লিখিয়া অনেক অন্যায় অঘটনও ঘটায়। অতএব সেও আজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল।

(৭)

পিতার শরীরমনের অবস্থা দেখিয়া বিনয় তাঁহার জন্য বড় ভয় পাইল। পিতার জন্য তখন তাহার বোনের উপরকার বিরক্তিও মনে রহিলনা। লীলার শ্বাশুড়ীকে চিঠি লিখিয়া—লীলা ও সুকুমারকে চিঠির পর চিঠি লিখিয়া কাহারো নিকট হইতে জবাব না পাইয়া শেষ কালে একদিন সে দায়ে পড়িয়া নিজেই লীলার শ্বশুরবাড়ী গেল। ইচ্ছা যে তাঁহাদের বুঝাইয়া সমঝাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়াই আনিবে। পিতাকেও সে সেই ভরসা দিয়া আসিল। ইতিপূর্ব্বে তিনবার লোক আসিয়া

অপমানিত হইয়াই ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু এবার দাদাকে,—যতই হোক—তাহারা দাদাকে নিশ্চয়ই ফিরাতে পারিবে না! লীলা আকুলকণ্ঠে ডাকিল, "হে মা কালি, হে মা দুর্গা! এদের সুমতি দাও মা, সুমতি দাও। বাড়ী গিয়ে আমি তোমাদের ভাল ক'রে পূজা দোব।"

কিন্তু দেবতারা মানুষের মত ঘুষ খাইয়া কাহারও অদৃষ্টলিপি কাট্‌কুট করেন না,—তাঁহারা এই বালিকার পূজার লোভে লুব্ধ না হইয়া স্থির হইয়া রহিলেন। লীলার শ্বাশুড়ী কঠিন মুখে কহিলেন, "ঢেঁটা মেয়েকে অনেক দুঃখে তবু একটুখানি এই সায়েস্তা ক'রে এনেছি বাছা, আর কি সে মুখো হ'তে দিই। বড়মানুষ বাপ আদর দিয়ে দিয়ে তো মেয়ের ইহ পরকাল দুটিই চিবিয়ে খেয়ে রেখেছিলেন। আমাদের হাড় জ্বালাবার, মাস পোড়াবার জন্যে। বাবা কি ঘরেরই মেয়ে ঘরে এনেছিলেম! আমি যাই শ্বাশুড়ী তাই সকল দিক সামলে নিচ্চি। আর কেউ হলে একবারে ছুলো ছুলো কুলো কুলো হ'য়ে যেত।"

বিনয় তখন ভগ্নিপতিকে গিয়া ধরিল,—"ছেলেমানুষ একবার পাঠাও, বাবার ওপর তোমার একটু মায়া হয় না? একবার দেখে এসো দেখি—তিনি কি হ'য়ে যাচ্চেন।" সুকুমার বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল,—"না হে না, সে সব হচ্চে টচ্চে না। কেন আর কথা বাড়াও! কেঁচো খুঁড়তে শেষে সাপ বার করবে?"

বিনয় বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল,—"এমন গোঁয়ার গোবিন্দর হাতেও লীলা প'ড়েচে!" ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ একটুখানি বাতাসে জ্বলিয়া উঠে, তেমনি মুহূর্ত্তে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়া সুকুমার বলিল,—"গোঁয়ার হই যা হই, মূর্খ অকালকুষ্মাণ্ড তো নই। যেমনি ভাই তেমনি বোন! যেমন ছোটঘরে বিয়ে ক'রেছি!"

রাগে রাঙ্গা হইয়া বিনয় গর্জ্জিয়া উঠিল,—"কি আমাদের ঘর ছোট ঘর! কে যে নীচ তার ব্যাভারেই তা ব্যক্ত হচ্চে।" গতিক দেখিয়া

লীলা ছুটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিনয়ের মুখ চাপিয়া ধরিল। তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া পাশের ঘরে লইয়া গিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। বিনয় ক্রোধে ও লীলা ভয়ে কাঁপিতেছিল। বিনয় যেন আহত সর্পের মত গর্জ্জাইতেছিল, সক্রোধে বলিল, "তোর জন্যেই তো এতটা অপমান আমায় সইতে হলো! জন্মে আর কখনও তোর নাম ক'রতে দোবো বাবাকে—থাক তুই।"

বলিতে বলিতে হঠাৎ বিনয় থামিয়া গেল, দেখিল লীলা নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। তাহার মুখ দেখিয়া তাহার মমতা হইতে লাগিল। আহা! কি কষ্টই সে সহিতেছে! লীলা মৃদুস্বরে বলিল,—"দাদা আমায় একটি ভিক্ষা দেবে?" বিনয় তাহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে চাহিল।

লীলা কহিল,—"বাবাকে এসব কথা কিছু বলবে না বলো!" বিস্ময়ের সহিত বিনয় জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কি, কেন লীলা?"

"বলচি, তুমি বলো বলবে না?" "কি বলব যখন তিনি তোমার কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন?" "বলো—বলো—নিজে সে এলো না,—আসতে চাইলে না।" বড় বিস্ময়ে বিনয় লীলার মুখে দৃষ্টি স্থির করিল, সে তখন আর কাঁদিতেছিল না। বিনয় কহিল,—"না লীলা এমন কথা আমি বলতে পার্ব্বোনা, তিনি তাতে কি কষ্টটা পাবেন তুমি তা'তো বুঝছ না। একি বলা যায়?"

লীলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"এ সব শুনলে তিনি আরও কষ্ট পাবেন, এ না হয় মনে করবেন—তাঁর লীলাই অকৃতজ্ঞ। আর সে যে তাঁর কেবলি মনে হবে—লীলাকে জলে ফেলে দিয়েছি—সে কষ্ট তাঁর পক্ষে বড্ডই যে সাঙ্ঘাতিক হবে দাদা!"

বাহির হইতে বাটীর গৃহিণী বধূর উদ্দেশে উঁকি দিয়া বিনয়কে শুনাইয়া বলিলেন, "ওগো নবাবের কন্যে, ঘরে দুয়োরে সন্ধ্যের বাত্তি পড়লো না, ঘরে দুয়ার দিয়ে ভেয়ের সঙ্গে গুজগুজুনি কি আজ আর

শেষ হবে না? ভাইকে বলে দাও—বাপ মলে তখন তার চতুর্থী করতে যাবে, যেন তখন এসে নে'যায়। এত দেমাক্ যে, আমার ছেলেকে বলে কি না 'গোঁয়ার ছোটলোক!' আমি যাই মা—তাই এখনও খ্যাংরার মুড়ি বার করিনি!"

বিনয় বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। লীলা দৃঢ়স্বরে তাহার কথা শেষ করিল, "বলো লীলা সুখে আছে,—ভাল আছে,—যদি তিনি তার খোঁজ খবর কখনও করেন—তা'হলে সে ঐ পুকুরে ডুবে মরবে,—তুমি যাও—আমার যা বলবার বলেচি—নিজে যা বলেছ—তা পালন করো, যাও, তুমি এক্ষণি এবাড়ী ছেড়ে চলে যাও। আর কখন এখানে এসো না।"

বিনয় বুঝিল পুখুরে না ডুবিয়াও লীলা আজ আত্মহত্যা করিল; দুই বিন্দু অশ্রু মুছিয়া সে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। গৃহিণীর শ্রুতিমধুর বিবিধ আপ্যায়িতপূর্ণ জলযোগের নিমন্ত্রণের লোভে এক মুহূর্ত্ত আর সেখানে দাঁড়াইল না।

হরেন্দ্রনাথ শুনিলেন,—লীলা আসিতে চাহে নাই! 'পাগল' বিনয় কি বলে তাহার ঠিক নাই! লীলা, সেই লীলা! তাঁহারই সেই লীলাতো? 'বিনয়, তুই ক্ষেপেচিস্!' বিনয় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া একটু ফিরাইয়া বলিল, "সে বল্লে বাবাকে ব'লো আমি ত সুখেই আছি,—কষ্ট ত কিছুই নাই, তবে কেন তা জানিনে,—এরা তোমাদের আসা টাসা কি চিঠি পত্র লেখা—পছন্দ করেন না। তা যখন করেনই না, তখন এ'তে আর দরকারই বা কি? এখন আমার পক্ষে এরা যাতে খুসী থাকে—তাইতো করা উচিত! বাবাকে বলো—তিনি যেন আমায় নিয়ে যেতে না চান, যদি কখনও দরকার হয়, তখন আমি নিজেই তাঁকে জানাবো। মিথ্যে এ সব নিয়ে কথা কাটাকাটি কি রাগারাগি আমার ভাল লাগে না।"

স্প্রীংগুলার কোন খানে হাত পড়িলে যেমন লাফাইয়া উঠে, তেমনি করিয়া হঠাৎ চমকাইয়া হরেন্দ্রনাথ উঠিয়া পড়িলেন। বিনয়ের একটা

হাত উভয় করতলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের উপরে পাগলের মত প্রখর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে উদ্ভ্রান্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "চুপ কর বিনয়, আর বলিস্‌নে,—লীলা—লীলা এই কথা বলেছে? তবে বুঝি সে সেখানে বড় কষ্টে আছে! তারা বুঝি তাকে বড় যন্ত্রণা দেয়? তাই তাকে জোর করে পাঠিয়েছি বলে—বুঝি সে দুঃখ ক'রে এই কথা বলেছে? বলরে,বিনয় বল, বল্—তুই কিছু লুকুসনে! ওরে, সব কথা আমায় খুলে বল!"

বিনয় বড় বিপদে পড়িল। পিতার সাক্ষাতে মিথ্যা কথা বলাও কঠিন, অথচ না বলিলেও এই ছোটলোকদের হাতে যখন তখন অপমান সহ্য করার হাত হইতে রক্ষা পাওয়াও যায় না। পিতার মনোকষ্ট যখন দুই দিকেই, তখন লীলা যাহা বলিয়াছে সেই মতে চলাই ভাল। এই ভাবিয়া উত্তর করিল, "না তা আর এমন কি কষ্ট! বেশ মোটা হয়েচে তো দেখলুম! সে-ই এই কথা আমায় বল্‌তে বলে দিলে তো।" ভাবিল,—এই রকম করিয়া বলাতে মিথ্যাবলার দোষ অর্শিল না।

মর্ম্মাহত হরেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। হায়, নিজের সন্তান এমন পর হইয়া যায়!

ব্যথার চেয়ে ব্লিষ্টারের জ্বালাও বড় কম নয়! হরেন্দ্রনাথ আজ বুঝিলেন—মেয়ে হয় পরের জন্য, কিন্তু ছেলে কখনও পর হয় না। বিনয়ের প্রতি তাঁহার ভালবাসা দ্বিগুণবেগে বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিল। শত যত্নেও মেয়েকে বাঁধিয়া রাখা যায় না, কিন্তু তার সিকি আদরেই ছেলের মন আপন ঘরে বাঁধাই আছে। অকৃতজ্ঞা কন্যাকে ভুলিবার চেষ্টায় বিনয়ের বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিলেন। অনেক দেখিয়া শুনিয়া অবশেষে একটি ফুট্‌ফুটে টুক্‌টুকে মেয়েকে পছন্দ করিয়া নব আশায় 'আশালতাকে' নিরানন্দ গৃহোদ্যানে রোপণ করিলেন। বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র এবং

লীলাকে আনার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুনয় পত্র বিনয় নিজেই সুকুমারকে পাঠাইয়াছিল, কিন্তু ইহার উত্তর পর্য্যন্ত আসিল না।

কিন্তু সেই যে অকৃতজ্ঞা পাষাণীর কি দুরন্ত স্মৃতি—তাহার হাত হইতে যেন কিছুতেই মুক্তি নাই। বধূ যখন ঝম ঝম করিয়া মল বাজাইয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে চলিয়া যায়, হরেন্দ্রনাথের বুকের ভিতরে আর চারিগাছি মলের বাজনা তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ডের তালে তেমনই শব্দ করিয়া বাজিতে থাকে। বধূর চুড়ির শব্দে, চাবির শব্দে, চমকিয়া উঠিয়া কতবার হরেন্দ্রনাথ ডাকিয়া ফেলিয়াছেন, "মাগো এলি?" বধূ—'বাবা' বলিয়া ডাকিলে—কত সময়ই অন্যমনে উত্তর দিয়াছেন, "কেন মা লীলা?" বৌমা বলিতে গিয়া লীলা নাম তো নিত্যই তিনি ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে সুদীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত মিলাইয়া ফেলিয়াছেন।

শরীরের রক্ত মাংসে গড়া, চিরদিনের স্নেহ মমতায় পোষিত, তাহাকে কি ভুলিবার যো আছে? সে সুখে আছে—তার সুখের ব্যাঘাত হইবে না। এই ভাবিয়া তাহার শ্বশুর বাড়ীর বিরাগের ভয়ে বাহ্য সম্পর্ক ত্যাগ করিতে চাহিলেও অন্তরের সম্বন্ধ তো এ জন্মে কাটিতে চাহে না। সে সম্বন্ধ তো পাতান সম্বন্ধ নয়, সে যে বিধাতাপুরুষ নিজেই আঁটিয়া বাঁধিয়া তৈরি করিয়া দিয়াছেন, তাকে কে ছাড়াইতে পারে? অনেক নিদ্রাহীন রাত্রে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া মর্ম্মাহত পিতা কন্যার উদ্দেশে ডাকিয়া বলিতেন,—"ওরে লীলা এক বার আয়রে, এক বার আয়। সেই কেঁদে চলে গেলি।—এক বার শুধু হাসি মুখে ফিরে আয় মা।"

মিলন ।

সুধার বিবাহ হইয়াছিল এই পর্য্যন্ত, সে তাহার স্বামীকে কখনও চোখে দেখে নাই। সেই যা বিবাহের দিন ও ফুলশয্যার রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে সাক্ষাৎ ও আলাপ।

সুধা কুলীন কন্যা নহে এবং গরীবের ঘরের মেয়েও নয়, তবু সে কেন তাহার এই সপ্তদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাকে স্বামী দর্শনে বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছিল, তাহার জীবনের সেই বিড়ম্বনা সম্বন্ধে একটু পূর্ব্বাভাষ দেওয়া আবশ্যক।

বিবাহের অল্পদিন পরেই সুধার পিতামহের সহিত তাহার শ্বশুরের একটা সামান্য বিষয় লইয়া মনোবাদ আরম্ভ হইয়া শাখায় পল্লবে সেটা ক্রমেই বহুবিস্তৃত হইয়া উঠে। সেই সময় সুধার শ্বশুর বলিয়া পাঠান,—'আজই আমার বউ পাঠিয়ে দাও, অমন বাড়ী আমি বউ রাখ্‌বো না।'

সুধার পিতামহ ইহার বেশ সদুত্তর দিয়া লোক ফিরাইয়া দিলে, উত্তর আসিল 'যদি এক হপ্তার মধ্যে বুড়ো নিজে এসে মেয়ে পৌঁছে ক্ষমা চেয়ে যায় তো ভাল,—নাহ'লে ফের ছেলের বিয়ে দেবো। আমি হরনাথ ঘোষ, আমার ছেলের পায়ে মেয়ে দিয়ে ওর চৌদ্দ পুরুষের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে, জানেনা! আমায় অপমান।'

কিন্তু বৃদ্ধ উমাপদ মিত্রও বড় কমজেদী তো নহেন। তিনি সকলকার সভয় মিনতি উপেক্ষা করিয়া উত্তর দিলেন,—'যদি কখন নিজে যাচিয়া আসিয়া পুত্রবধূ লইয়া যানতো তাঁহার নাতিনী সে ঘরে ঘর করিতে যাইবে, এ না হইলে তিনিও মেয়ে পাঠাইবেন না।'

শুনিয়া পাড়ার লোক ছিছি করিতে লাগিল, পুত্র সভয়ে অনুনয় করিয়া বলিলেন 'বাবা এতে কি ভাল হলো? মেয়েটা যে জন্মের মত যায়!' বৃদ্ধ শুধু ভ্রূকুটী করিলেন, উত্তর করিলেন না।

ইহার পর একদিন লাল কাগজে সোনালি অক্ষরে ছাঁপা এক নিমন্ত্রণ পত্রে এই খবরটী জানা গেল,—"আগামী ১৭ই আষাঢ় রবিবার আমার পুত্র শ্রীমান সুধীর চন্দ্রের দশঘরা নিবাসী শ্রীযুক্ত রামহরি বসু মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাসীর সহিত শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইবে। মহাশয়েরা সবান্ধবে"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুধার মা এই সংবাদ পাইয়াই শয্যা গ্রহন করিলেন। পিতা আর এক বার পিতার কাছে অনুনয় করিতে গিয়া, দ্বিগুন হতাশা লইয়া ভগ্নমনে ফিরিয়া আসিলেন। সুধা কিছু ভাল করিয়া না বুঝিলেও—তাহার পক্ষে যে একটা কিছু ভয়ানক রকমই কাণ্ড ঘটিতেছে ইহা বুঝিয়া মুখ মলিন করিয়া রহিল। আপনার জেদে জেদী বৃদ্ধ উমাপদ তৎক্ষণাৎ তাঁহার উকিল ডাকাইয়া এক উইল প্রস্তুত করাইলেন। তাহাতে আর সব কথার সঙ্গে এই কথাটা রহিল,—'তাঁহার জ্যেষ্ঠা পৌত্রী শ্রীমতী সুধাময়ী নগদ ১৫০০০ টাকা পাইবে।'

"যদি তাহার স্বামী তাহাকে গ্রহন না করিয়া অন্য দার পরিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে এই পিতামহদত্ত টাকায় সুধার স্বামীর কোনই সত্ত্বাধিকার জন্মিবে না।

যদি তাহার স্বামী দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণের পর আবার কখন তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহেন, এবং সুধা স্বপত্নীর—স্বামী গ্রহণে সন্মত হয়, তাহা হইলে তাহার এই পিতামহ দত্ত সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব থাকিবে না।"

ইহার অর্থ, হরনাথ ঘোষ বোধ হয় বধূর এই মোটা রকম নগদ টাকাটা ত্যাগ করিবেন না! তাঁহার এদিকে যে বিলক্ষণ লোভ আছে,—

তাহা এই সম্প্রতি তাঁহার সহিত কুটুম্বিতা সূত্রে আবদ্ধ—উমাপদ মিত্রের তো আর অজ্ঞাত ছিলনা!

যাহা হউক, তাঁহার জাল পাতিবার উদ্দেশ্যটা আর এক দিক দিয়া সফল হইয়া গেল, জামাতা সুধীর চন্দ্র এই নূতন বিবাহটার ঠিক পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। প্রথমটা এই কাণ্ডে উমাপদর হাত আছে সন্দেহে হরনাথ তাঁহার পরেই অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন, অল্প পরেই জানা গেল,—যে, তা নয়; তিনি তখন পি এণ্ড কোং-র 'আপলো' নামক জাহাজে আরব সমুদ্র পার হইতেছেন। তাঁহার বি এ পাসের ৪০৲ টাকা বৃত্তি জমানয় ও বিবাহে দাদাশ্বশুর-দত্ত বহুমূল্য ঘড়ি, চেন, হীরার আংটী, আশীর্ব্বাদী ও সম্প্রদানের দক্ষিণা প্রভৃতির গিনি মোহর প্রভৃতি,—যা কিছু বিক্রয় করিয়া যাহা পাইয়াছেন,—তাহা লইয়াই আত্মরক্ষার্থ গৃহত্যাগ করিয়াছেন! পত্রের শেষে লেখাছিল,—"

"বাবা! আপনার অবাধ্য হইলাম বটে; কিন্তু তবু আম নিশ্চিত জানি যে, আপনার অগাধ স্নেহ আমার এ অপরাধকে ক্ষমা করিতে অসমর্থ হইবেন না!"

(২)

তাহার পর সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর গত হইয়াছে। সুধীর চন্দ্র এখন সিভিল সার্ভিস পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। য়ুরোপ হইতে এক বৎসর হইল ভারতে আসিয়াও সুধীর কিন্তু এ পর্য্যন্ত,—দেশ বলিতে সাধারণে যাহা বুঝে,—অর্থাৎ স্বগ্রামে পদার্পণ করেন নাই। বোম্বায়ে সে চাকরি পাইয়াছিল, আসিয়া অবধি সে সেইখানেই আছে। হঠাৎ বাড়ী আসিলে যদি গ্রামে কোনরূপ বিপ্লব দেখা দেয়,—ভয় সেই খানে। বাড়ীর লোকের ক্ষমা করিতে অবশ্য বিলম্ব ঘটে নাই। বাপ আসিয়া দেখ করিয়া গিয়াছেন, শ্বশুরও একবার পূজার বন্ধে দেশ ভ্রমনের ছলে জামাতাকে

দেখিতে আসিয়া ছিলেন। কিন্তু সুধারই ভাগ্যে এ পর্য্যন্ত স্বামীসন্দর্শন ঘটিয়া উঠিল না। তাহার শ্বশুর হরনাথ ঘোষ ও পিতামহ উমাপদ মিত্র উভয়েই এখন পরস্পরের হারমানার প্রতীক্ষা করিয়া অনর্থক এই বিলম্বটা করিতেছেন। দুজনেই ভাবিতেছিলেন,—একবার মুখ ফুটিয়া বলিলে হয়! কিন্তু জেদে উভয়েই সমান। কে প্রথম ঘাট্ মানিয়া নিচু হইতে যাইবে?

শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া সুধীরের পিতা সুধীরকে প্রথমে দেশে আনাই স্থির করিলেন। বিধান ব্যবস্থা লইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠবার সব উদ্যোগ হইল। পিতৃ পিতামহের জলপিণ্ড নহিলে যে লোপ পায়। সুধীরও ইহাতে অমত করিলনা। সে আসিয়া যথা কার্য্য শেষ করিয়াই একদিন থাকিয়া, 'ছুটী নাই' বলিয়া, কর্ম্মস্থলে মাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল। সে ও সেই জেদী পিতার পুত্র—পিতা না বলিলে, আর দাদা-শ্বশুর না ডাকিলে, সেই বা কেন যাচিয়া শ্বশুরবাড়ী যাইবে? বেচারী সুধারই শুধু কোন রকমেরই মানাভিমানের জিদ ছিল না। সে শুধু লজ্জার দায়ে পড়িয়া মাঝে হইতে এই কষ্টটা পাইতেছিল। আর তাহার বাপ মার কষ্টতো তাহার চেয়েও অধিক।

তাহারা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া দিন কাটাইতে ছিলেন বটে, কিন্তু জামাতার ধরণ ধারণে তাঁহাদের মনে ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ঠ আশাও যেন ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছিল। বিলাতের পরশমনি যে এই বঙ্গ যুবককে পিত্তল হইতে সোনায় পরিণত করিতে পারে নাই, তাহা তিনি স্বয়ং তাহার বাসায় গিয়া দেখিয়া আসিয়া ছিলেন। এমনই ভাবে চলিতে চলিতে হঠাৎ একদিন বুঝি সুধার একঘেয়ে জীবন নদীতে একটা ছোট রকম বন্যা আসিল। একদিন প্রভাতে সে একখানি সাদা সিধা চৌকা খাম ছিঁড়িয়া চোখ মুখ লাল করিয়া একগা ঘামিয়া এই পত্রখানি পাঠ করিল;—

সুধা!

তুমি আমায় চেননা; তবু এইটুকু আশা করে লিখচি যে, হয়ত আমায় একেবারে ভুলেও যাওনি। যদি জিজ্ঞাসা করো হঠাৎ আজ কেন এতদিন পরে এ চিঠি লিখচি? তার উত্তর দিতে হয়ত আমি পেরে উঠ্‌বো না। কেন না নিজেই তা' ত দেখছি বুঝে উঠতে পারছিনে। আজ এই চিঠিটুকু লেখবার বড়ই লোভ হোল, তাই একটু লিখে ফেললুম। এর জন্য কি বাড়ীর লোকেরা রাগ করবেন?—সুধীর।

সুধার বিবাহের দিন ধরিয়া ৫ বৎসর তিন মাস সাতদিন পরে এই সুধার প্রথম প্রেম-পত্র লাভ! সুধা এখন তো বড় হইয়াছিল, তাহার নিজের সঙ্গীন অবস্থা বুঝিবার সময় তাহার হইয়াছে। সে জোর করিয়া লজ্জা অভিমান ত্যাগ করিয়া কাহারও মধ্যস্থতা ব্যতিরেকেই লিখিল,—"এতদিন পরে অভাগিনী সুধাকে তবে আবার মনে পড়িয়াছে? যদি মনে পড়িয়াছে—তবে দয়া ক'রে মনেই রেখো. আর যেন ভুলনা যে, আমি তোমার চিরদুঃখিনী সুধা।"

চিঠি পাঠাইয়া দিয়া সুধা বুঝিল এ চিঠির ধরণটা যেন নভেলী ছাঁদের হইল! কিন্তু তখন আর সে কি করিতে পারে? চিঠি তো ডাক বাক্সের দিকে অগ্রসর হইয়াই গিয়াছে। যা হয় হোক,—এই ভাবিয়া সে লজ্জা ভুলিবার চেষ্টায় অধিকতর লজ্জিত হইয়া রহিল।

ইহার পরে উভয়েরই ২।৩ খানা পত্র বিনিময় হইয়াছিল। শেষ পত্রে সুধা জানিল তাহার স্বামীর শরীর তেমন সুস্থ নাই। তিনি কিছুদিনের জন্য ছুটির দরখাস্ত করিয়াছেন। হয় তো দার্জ্জিলীং, নয়তো সিমলা; এমনি একটা কোথাও যাইবেন। সঙ্গে থাকিবেন তাঁহার পিতা।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুধা ভাবিল; 'তবু বলতে পারেন নি—তোমার কাছে যাবো,—কি তোমায় আনতে যাবো,—পুরুষ মানুষ কত নিষ্ঠুরই হয়!'

পূজার বন্দে পিসিমার বাড়ী পিতার সহিত বেড়াইতে আসিয়া সুধা একটু আনন্দ পাইল। পিসিমার মেয়েরা তাহার সমবয়স

কয়েক দিন গত হইলে একদিন সুধা, স্নেহ ও নীরদ মার্ব্বেল রক দেখিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সুধার পিসিমা বলিলেন,—"আজ থাক্ বাছা, আজ উনি বাড়ী নেই; আর একদিন তখন যেও সব।" কিন্তু মেয়েরা কিছুতেই সে কথায় কান দিল না। সুধা বলিল—"তা নেই বা পিসেমশায় থাকলেন, বিনোদ'দা আমাদের নিয়ে যাবেন। তোমার দুটী পায়ে পড়ি পিসিমা, আজ আমাদের যেতে দাও। কোন দিন আবার বাবা ফিরে যেতে চাইবেন, তার কি কিছু ঠিক আছে? আজি আমরা দেখে আসি।" অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিসিমা সম্মতি দিলেন। মেয়েরা আনন্দে তাড়াতাড়ি যেমন পারিল গুছাইয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

বিনোদ কুমার দর বাড়াইবার জন্য একবার একটু মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন,—"আমি যে তোদের এতগুলোকে ঘাড়ে ক'রে বইব, তা' তার জন্যে কি আমায় তোরা দিবি তা বল্।"

স্নেহ রাগিয়া বলিল, "দোব আবার কিগো? বড় ভাইকে বুঝি আবার কেউ কিছু শোধ দেয়?"

"নাঃ দেয় না। বড় বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছে! সুধা তুইতো ভাই খুব বড় মানুষ, তুই কি দিবি তাই বল্ দেখি? তুই হলি ম্যাজিষ্ট্রেট-মহিষী,—যে সে কি!"

সুধার কর্ণমূল হইতে চক্ষের প্রান্ত পর্য্যন্ত লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। কি হিসাবে তাহাকে বড় মানুষ বলা হইতেছে,—তাহাই বুঝিয়া কি তাহার এ লজ্জা? হায়, বিনোদ তো তাহার অন্তরের বিপুল দৈন্য দেখিতে পায় না!

কিন্তু তা পায়! বিনোদও তো তাহার সত্যকার অবস্থা না জানে তা নয়! এই পরিহাসে তাহার মুখের করুণ ভাব দেখিয়া বিনোদ পরিহাস সম্বরণ করিয়া বলিল, "নে, নে তোরা যাবিতো তৈরী হয়ে নে চট ক'রে।"

সুধা অনুরোধ করিল, "পিসিমা তুমিও চলো না।"

পিসিমা ইহাতে রাজী হইতে পারিলেন না। কহিলেন,—"না বাছা উনি, দাদা কেউ বাড়ী নেই, কখন ফিরে আসেন,—সবাই বাড়ী ছেড়ে গেলে কি চলে? না হয় আমার দেখা নাই হোলো, দেবতাও নয়, ঠাকুরও নয়, ঝরনা, পাহাড় এ সব আমার দেখতে যেতে বড় ইচ্ছাও করে না। তোরা যা, খুব সাবধানে যাস্।" "পিসিমার যেমন সবেতেই ভয়, এই তো এখান থেকে এখানে,—তার আবার সাবধানই বা কি? আর কিই বা কি?"

পৌছিতেই বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল, দেখা শুনা করিতেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। যখন শ্বেত মর্ম্মরের উপর প্রচণ্ড বেগে সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মি-বিমিশ্র—স্বর্ণবর্ণ জলস্রোত আছড়াইয়া পড়িয়া হীরক চূর্ণের ন্যায় চারিদিকে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল, তখন সেই দৃশ্য হইতে কাহারও চোখ ফিরিতেছিল না। ক্রমেই যে সেই জলের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, তাহা তখন যেন কাহারও লক্ষ্য পর্য্যন্ত ছিল না। কিন্তু এ পৃথিবী শুধু ভাবেরই রাজ্য নয়,—ইহা বাস্তব, এবং গতিশীল। সহসা ভাবে বিভোর সেই দর্শকগণকে সচেতন করিয়া তুলিয়া ঘোর হুহুঙ্কার সহকারে অশনিভরা মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল। তখন ফিরিয়া সকলেই এক সঙ্গে দেখিলেন,—কালো মেঘে নীল আকাশে একটুও আর কোনখানে ফাঁক পর্য্যন্ত রাখে নাই। চারিদিকের গাছ পালা-গুলা অমন স্তব্ধ হইয়া যেন কি একটা বিপ্লবেরই জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। স্নেহ ইহা দর্শন করিয়া বলিল,—"এই সময় এমনি নির্জ্জন

জায়গায় ছুটোছুটি করতে বড় ভাল লাগে। আয় ভাই ছুটে গিয়ে ওই দেবদারু গাছটা কে আগে ছুঁতে পারে।”

তাহারা সেই অদূরে গাছ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। বিনোদের বারণ ও আহ্বান কেহই নিজেদের সে বন্ধনমুক্তির উৎসাহে কানেই তুলিল না।

খাণিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কেহ ফিরিল না দেখিয়া, বিনোদও তাহাদের ফিরাইয়া আনিতে—তাহাদের দিকে তখন ব্যস্ত হইয়া ছুটিলেন। মেঘ তখন আকাশের কানায় কানায় ভরিয়া—আর ভরিবার জায়গা পাইতেছিল না। ঝড় এইবার আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, তাহা পাখীদের দেখিলেই বোঝা যায়। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া যেন চারিদিক হইতে সমস্ত গাছ পালা হঠাৎ এক সঙ্গে ঝাঁকড়া মাথা দুলাইয়া হাসিয়া উঠিল। হুহুশব্দে বাতাস সেই অট্ট হাসিতে যোগ দিয়া তাহার ভৈরব বিষাণ বাজাইয়া দিল। আকাশে গম্ভীর বজ্রধ্বনি হইল, বিনোদ চীৎকার করিয়া ডাকিলেন।

“স্নেহ, সুধা, নীরু, ওরে তোরা শীগ্‌গির ফের, সহরের দিকে ছুটে চল,—ওরে শীগ্‌গির ফের।”

কড় কড় শব্দে তাঁহার সে উচ্চ শব্দ কোথায় ডুবাইয়া দিয়া লহরে লহরে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে পট্ পট্ শব্দে বৃক্ষ লতা ছিঁড়িয়া, উপড়াইয়া, ভাঙ্গিয়া, স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে একসা করিয়া দিয়া সর্ব্বত্রই ওলট পালট বাধাইয়া, এক ভীষণ ঝটিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। মেঘের অন্ধকারে একবারে চারিদিক অন্ধকারময় হইয়া গেল।

যখন ঝড় থামিল তখন গভীর অন্ধকারে আকাশ পাতাল পরিপূর্ণ। মূষল ধারে বৃষ্টি হইয়া রাস্তায় প্রায় এক হাঁটু কাদা।

বিনোদ স্খলিতপদে দুই ভগিনীর দুই হাত ধরিয়া—ধীরে ধীরে সেই অতি পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। সুধাকে এই দুর্য্যোগের মাঝখানে

কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, কোথাও আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছেনা। কোথায় গেল? এই অশ্রান্ত বৃষ্টি-ধারার মধ্যে আর দুটি শীতার্ত্ত ভয়ার্ত্ত বালিকা সঙ্গে বিনোদ নিজেকে বড় বিপন্নই বোধ করিল। কোথায় যায়? ইহাদের কি করে? সুধাকেই বা খোঁজ করিয়া বেড়ায় কোথায়?

এদিকে ঝড়ের মধ্যে ছুটিতে ছুটিতে কে কোথায় গিয়া পড়িয়াছিল তাহার ঠিকানা ছিল না। যখন বৃষ্টির ঝাপ্‌টা খুব জোরে পিঠের উপর আছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ হইল, তখনই সকলের সঙ্গ ছাড়া হইয়া চারিদিকে জমাট বাঁধা অন্ধকারের মাঝখানে সুধার প্রথম চট্‌কা ভাঙ্গিয়া দারুণ ভয়ে সে একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে—কণ্ঠ হইতে শব্দ বাহির হইতেই চাহে না। তবু প্রাণপণ শক্তিতে কোন মতে কাতর কণ্ঠে সুধা ডাকিল—"বিনোদ দা, নীরু, ও ভাই-মেজদি!"

আবার মেঘ ভৈরব গর্জ্জনে ডাকিয়া উঠিল, বৃষ্টি আরও জোরে চাপিয়া আসিল, আর কোন সাড়া আসিল না। ভীতা সুধা দিক-নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া যেদিকে পারিল জ্ঞানশূন্যবৎ একদিকে ছুটিতে লাগিল। কোথা যাইতেছে,—কোথায় যাওয়া উচিত,—সে জ্ঞানটুকুও হয় তো তাহার ছিল না। কেবল একটু হুঁষ ছিল যে, ইহার একটি দিকে নদী আছে। ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ কিসে বাধা পাইয়া সহসা সে হোঁচট খাইয়া চৌচাপটে আছড়াইয়া পড়িয়া গেল। "মাগো!" বলিয়া কাতরোক্তি করিয়া উঠিল। বোধ হইল যেন পায়ের হাড়টা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পায়ের যন্ত্রনা একটু পরে ঈষৎ কমিয়া আসিলে হাত বাড়াইয়া বাড়াইয়া সে দেখিল—যাহা তাহাকে বাধা দিয়াছে—তাহাই হয় তো এই বৃষ্টি-ধারা হইতে আশ্রয়ও দিতে পারে। সেটা একটা বাংলো বাড়ীর সাম্‌নের সিঁড়ি।

আশ্বস্ত চিত্তে সে তখন সাবধানে পৈঠা কয়টি উঠিয়া অতি কষ্টে আহত পা'টাকে টানিয়া টানিয়া বারান্দায় উঠিল। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া ঘরের

দ্বারও স্থির করিল। কিন্তু কে আর এ দুর্য্যোগে দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিবে ? দরজা ভিতর হইতে খিল্ আঁটিয়া বন্ধ করা। সুধার তখন বড় দায় ! যার পর নাই ;—সেই প্রাণের দায় তাহার উপস্থিত ! এখন—কাহার বাড়ী এটি, ইহার কি বৃত্তান্ত—এসব কিছুই ভাবিবার ক্ষমতা বা বুদ্ধি তাহার মাথায় নাই। তাহার একটু আশ্রয়ের নিতান্ত দরকার। তা বাঘের বাসা হইলেও সে এখন তাহাতে প্রবেশ করিতে রাজী আছে। প্রাণপণে দ্বার ঠেলাঠেলি করিয়া সে ডাকিল, "ওগো কে আছ গো,—দোর খোল"।

কিন্তু সে দুর্য্যোগে—প্রকৃতির সেই উচ্চ ক্রন্দন রোলে, সুধার সেই পরিশ্রান্ত কাতর ক্লান্ত আহ্বান কেহই শুনিতে পাইল না। সেও আর বেশীক্ষণ সে অবস্থায় দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, অবসন্ন হইয়া সেইখানেই দ্বারের কাছে শুইয়া পড়িল।

সুধা যখন চোখ চাহিল,—প্রথমটা তাহার স্বপ্নই মনে হইয়াছিল। তার পর ভাল করিয়া চোক মুছিয়া উঠিয়া বসিতে, তখন বুঝিল স্বপ্ন নয়, সত্য সত্যই সে এক অপরিচিত শয্যায় আশ্রয় পাইয়াছে।

সে ধীরে ধীরে সেই এতক্ষণকার আশ্রয় পালঙ্ক হইতে নামিয়া একটু অগ্রসর হইতেই উভয় গৃহের মধ্যস্থ একটি দ্বারের পর্দ্দা নড়িয়া উঠিল এবং সেই দরজা দিয়া কে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক এই ঘরে প্রবেশ করিয়াই সসম্ভ্রমে বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে আপনি উঠেছেন।"

সুধা অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে মাথা নিচু করিল। সে অবশ্য বুঝিল,—ইনিই তাহার আশ্রয়দাতা। আশ্রয়দাতাকে যে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত তাহা তাহার একবারের জন্যও মনে পড়িলই না,—বরং সে একটু অসন্তুষ্ট হইয়াই ভাবিল,—"এ লোকটিতো বাঙ্গালী দেখচি, বোধ হয় এ বাড়ীর মেয়েরাও এ বাড়ীতে আছেন, তা তাঁদের কারুকে পাঠালেই তো হ'তো ? এ আবার কেমন ভদ্রতা বাবু ?"

আগন্তুক তাহাকে নীরব দেখিয়া আবার বলিলেন—"আপনার কাপড় জামা সমস্তই ভিজে, এই পাশের ঘরটায় অন্য কাপড় পাবেন। ওগুলো ছেড়ে আসুন। তা না হ'লে হয়ত অসুখ করবে। অনেকক্ষণ যদিও ওগুলো গায়েই রইলো,—কি করি উপায় ছিল না। মাপ কর্ব্বেন,—আমার এখানে স্ত্রীলোক দাসী পর্য্যন্ত একটা নেই। তাই অন্যায় হচ্চে জেনেও আমায় আপনাকে এই অবস্থায় রেখে দিতে হ'য়েচে।" সুধার অত্যন্ত শীত করিতেছিল, দ্বিরুক্তি না করিয়াই সে তাই তখনি পার্শ্বের স্নানাগারে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে চলিয়া গেল।

সে ঘরে তাহার জন্যই বোধ করি একটা আলো ছিল, কোঁচান সরু পাড় ধুতি ও একখানা রামপুরী চাদর মাত্র সে আলনার উপর দেখিতে পাইল।"

কাপড় চোপড় সব ছাড়িয়া, চুলগুলি তোয়ালে দিয়া মুছিয়া, সে পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, গৃহস্বামী সেই ঘরেই একটা চৌকিতে বসিয়া আছেন। অনেকখানি প্রকৃতিস্থ হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই সুধা মনে মনে এ নূতন আশ্রয়ের নূতন বিপদ অনুভব করিতেছিল। এখন ইঁহাকে কাছে দেখিয়া তাহার সে ভয়টা আরও একটু বেশী হইল। এই নারীশূন্য গৃহে, অচেনা পুরুষের সঙ্গে কেমন করিয়া সে নিশি-যাপন করিবে? তাহার নিকট মনের ভয় সে চাপিতে পারিল না, সভয়ে বলিয়া উঠিল—"বিনোদ দাদা কি আসেন নি?"

গৃহস্বামী—সেই কেদারায় উপবিষ্ট পুরুষ—তাহার সাড়া পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন—"তিনি কে? কই কেউ তো আসেন নি। আপনি দেখছি বাঙ্গালীর মেয়ে। আপনার এ রকম নিরাশ্রয় অবস্থা কেন?"

সুধার এইবার চোখ ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল। অতি কষ্টে সে চোখের জল চাপিতে চাপিতে রুদ্ধপ্রায় স্বরে বলিল—"আমরা মার্ব্বেল

রক দেখ্‌তে এসেছিলুম। সন্ধ্যার গাড়ীতেই বাড়ী ফিরতুম, তা হঠাৎ ঝড় এসে পড়লো, কে কোথায় গিয়ে পড়লো,—আমিও এইখানে,—" বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছাপাইয়া টস্ টস্ করিয়া ফোঁটা কয়েক জল ঝরিয়া পড়িল। আবার পড়িতে যদি আরম্ভই করিল, তো আর থামিলনা। সন্ধ্যারাত্রের সেই সর্ব্বনেশে বৃষ্টিটার মতই তাহা অঝোরে পড়িতে লাগিল।

তাহার আশ্রয়দাতা বড় বিপদেই পড়িলেন। কি বলিয়া তিনি এই সুন্দরী অতিথিকে সান্ত্বনা দিবেন, অথবা কি যে করিবেন, কিছুই যেন তিনি ভাবিয়া কুল কিনারা দেখিতে পাইলেন না। কিছুক্ষণ বিব্রতভাবে দাঁড়াইয়া, তাহার কান্না দেখিয়া, অবশেষে বলিলেন,—"তিনিও কোথাও এমনি আশ্রয় নিয়েছেন আর কি। সকালেই আমি তাঁর খোঁজ কর্ব্বো, আজ আপনি বড় পরিশ্রান্ত হ'য়েছেন, এখন একটু বিশ্রাম করুণ, আমিও ঘরে যাই।"

তিনি দরজার দিকে দু'পা অগ্রসর হইয়াই আবার ফিরিলেন। কারণ তাঁহার পশ্চাতে একটা অতি ভীতিপূর্ণ অস্ফুট শব্দ শোনা গিয়াছিল।

সুধা একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া একটু দৃঢ়ভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—

"না না এমন ক'রে এখানে আমি থাক্‌তে পারি না, আমি তার চেয়ে রাস্তায় ব'সে থাকবো—সেও ঢের ভাল।"

তাহার আশ্রয়দাতা একজন তরুণ যুবক,—তাঁহার শরীরের রক্তও অবশ্য খুবই ঠাণ্ডা নয়। তিনি তাহার এই ভয়, সন্দেহ ও অকৃতজ্ঞতা দেখিয়া নিজেকে কিঞ্চিৎ অপমানিত বোধ করায়—তাহার উপর ঈষৎ বিরক্ত হইলেন। একটু রুষ্টভাবে বলিলেন—"কেন এখানে কি আপনার কোন অসুবিধা হ'চ্ছে? বলুন,—তা না হ'লে কি জন্য এ রকম কথা বলছেন? আপনাকে ভদ্র ঘরের মেয়ে বলে মনে হ'চ্ছে, আমিও আপনারই একজন স্বদেশী ভদ্র লোক। আমাদের কি একটুও মনুষ্যত্ব নাই, আপনারা এই

রকম মনে করেন? আমাতে আপনি কিছু যদি অভদ্রতা দেখে থাকেন, তা'ও স্পষ্ট ক'রে আমায় বলুন, আমি তা হ'লে সেটা এখনি শুধ্‌রে নিই।"

গর্ব্বিত কথাগুলা ও বক্তার মুখে তেমনি সগর্ব্ব ভাব সুধার মনে ইহার প্রতি যেন কতকটা বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে চাহিল। কিন্তু সে অনেক পুস্তকে পড়িয়াছে যে, সকল সময় বাহির দেখিয়া মন্দ লোককে চেনা যায় না। রামায়ণের সন্ন্যাসী-বেশী রাবণ প্রভৃতির অনুকম্পায় দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

সে ধীরে ধীরে কহিল, "আপনি রাগ ক'রবেন না। এখন তো ঝড় বৃষ্টি থেমে গেছে,—আমি কেন এইবার যাই না?" এই বলিয়া সে আরও একটু অগ্রসর হইল।

গৃহস্বামী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না না তাকি হ'তে পারে? এ রাত্রে এ দুর্য্যোগে আমি কি আপনাকে একলা ছেড়ে দিতে পারি?"

সুধা ভয়ে বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিল, "ওমা! আমি তবে কি ক'রবো?" ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হইতে গিয়া গৃহস্বামীর হঠাৎ মনে পড়িল যে, এটা ইউরোপ নয়, এটা ভারতবর্ষ! বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে এই দুর্য্যোগে এক রাত্রি অচেনা দেশে, এক নারীশূন্য গৃহে, অপরিচিত পুরুষের সঙ্গ খুবই ভীতিজনক সন্দেহ নাই। নিজের অন্যায় অভিমানে লজ্জিত হইয়া তাই একটু দয়ার্দ্র কণ্ঠেই বলিলেন, "তবে এক কাজ করা যাক্‌, আমি আপনার বাড়ীতে একটা টেলিগ্রাম করি। তাঁরা এসে আপনাকে নিয়ে যাবেন। এখন তাঁদের ঠিকানাটা কি বলুন দেখি?" অশ্রুপ্লাবিতা সুধা কলের ন্যায় বলিয়া গেল, "বিপিনবিহারী রায়—সেরপুর।"

টেলিগ্রাম পাঠাইয়া আসিয়া যুবক দেখিলেন,—সুধা তখনও সেইখানে দাঁড়াইয়া অঝরঝরে কাঁদিতেছে। তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা করিতে লাগিল দুইটা ভাল কথায় এই বিপন্না নারীকে একটু সান্ত্বনা করিয়া তাহার চোখের

অজস্র প্রবাহিত জলের ধারা থামান। কিন্তু কেমন একটা অনভ্যাস-জনিত লজ্জাও বোধ হইল। তা ছাড়া সেটা কি ভাবে এই সঙ্কিন্ন-চিত্তা নারী গ্রহণ করিবে সে সম্বন্ধেও একটু ভয় ছিল। একটু বিপন্ন-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্বল্প পরে বলিলেন, "চুপ করুন ; বোধ হয় ভোর চারটের ট্রেনে কেউ না কেউ সেরপুর থেকে এসে পৌছিবে। দুর্য্যোগ থেমে গেছে যখন, তখন আসার কোন বাধা নিশ্চয়ই পড়বে না।"

সুধা এইবার একটু কৃতজ্ঞ ভাবে তাহার আশ্রয়দাতার মুখের দিকে চাহিল। তাঁহার সৌম্য সুন্দর মুখে ও করুণ দৃষ্টিতে তাহার এতক্ষণ পরে তাঁহার উপর যেন একটু বিশ্বাস ও ভরসা জন্মাইতে চাহিল। সে ধীর-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে ?"

যুবক মনে মনে একটু হাসিয়া বলিলেন—"আমি একজন ভদ্র কায়স্থ-সন্তান। আমার নাম সুধীর চন্দ্র ঘোষ।"

নামটা শুনিয়া সুধার মুখটা একটু লাল হইয়া উঠিয়াছিল, একটু ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিল—"সংসারে এক নামের কত লোকই থাকে ?"

ক্লান্তা সুধা অতি শীঘ্রই এই অপরিচিত পরাশ্রয়ে বিপদের ভয় ভাবনা ভুলিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তথাপি সেই মৃদুস্পর্শেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ চাহিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে প্রথমটা সে নিজের দৃষ্টি ও বুদ্ধিকে অবিশ্বাস করিয়া আড়ষ্ট হইয়া রহিল। কিন্তু সেই এক মুহূর্ত্ত পরেই যখন অবিশ্বাস করিবার আর কিছুই রহিল না, তখন ক্রোধে ও বিরক্তিতে তাহার ক্ষুদ্র ললাট কুঞ্চিত ও সুকৃষ্ণ নেত্রদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল। আহত হইলে ফণিনী যেমন করিয়া ফণা তুলে, তেমনি করিয়া সে তাহার জলসিক্ত কেশগুচ্ছ মুখের উপর হইতে অপসারিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুধীর একটু যেন অপ্রতিভ ভাবে ঈষৎ সরিয়া গেলেন। সুধা একবার মাত্র তাহার রাগ-রক্তিম বিশাল নেত্রের তীব্র দৃষ্টি তাঁহার কুণ্ঠিত মুখের উপর বজ্রের মত নিক্ষেপ করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। দ্বার খুলিয়া যখন সে বাহির হইয়া যায় যায়, তখন সহসা গৃহস্বামীর ক্ষণিক নিশ্চলতা দূর হইল। তিনি ছুটিয়া আসিয়া দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন, মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"সুধা, কোথা যাচ্চো!"

সুধার উজ্জ্বল চোখে তীব্র ঘৃণা ফুটিয়া উঠিল। ক্রোধ-কম্পিত বিদ্রূপের স্বরে সে বলিল, "আপনি না ভদ্র কায়স্থ-সন্তান!"

গৃহস্বামী সুধার রাগ দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, সেই ভাবেই বলিলেন, "হ্যাঁ সুধা, আমার পরিচয়টা আমি মিথ্যা দিইনি। যা বলেছি সত্যই আমি তাই। এ ঘরের সব দোরগুলো তুমি ভিতর থেকে বন্ধ ক'রেছিলে তাই এই দোরটা খুলেই এসেছি,—তোমার ঘুমভাঙ্গা পর্য্যন্ত আমি আর অপেক্ষা করে থাকতে পারিনি।" সুধীর তাহার হাত ধরিল—"সুধা!" ক্রুদ্ধ সুধা তাঁহার হাত ঠেলিয়া দু'পা পিছাইয়া গিয়া ক্ষোভে দুঃখে কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিয়া উঠিল—"তুমি এত বড় পাপিষ্ঠ!"—বলিতে বলিতে নিজের একান্ত অসহায় অবস্থা ভাবিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল, আর আত্মদমন করিতে পারিল না। তখন গতিক বড় মন্দ দেখিয়া সুধীর আর তামাসার লোভটুকু বজায় রাখিতে পারিলেন না। পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া সুধার হাতে দিয়া হাসিয়া বলিলেন—"এটা কার হাতের লেখা বল্‌তে পারো?"

সুধা তাহার পিতার হস্তাক্ষর তৎক্ষণাৎ চিনিয়া আগ্রহভরে সেই পত্র পাঠ করিতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে তাহার মুখ প্রথমে সাদা, ও পরে গাঢ় রক্তবর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। পাঠ শেষে অধিকতর সলজ্জমুখে সে মাথা নিচু করিল, তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যেন কিসের তাড়নায়

কাঁপিতেছিল। চিঠিখানা সেই আবেগ ও আবেশ-কম্পিত শিথিল হস্ত হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল।

দর্শক নীরবে সতৃষ্ণ সকৌতুক দৃষ্টিতে সুধার এই ভাববিপর্য্যয় দেখিতে ছিলেন। চিঠিখানি ভূমি হইতে কুড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "দেখলে ত তোমার বাবা লিখ্ছেন;—

পরমশুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন, বাবা সুধীর!

আমি আজ বৈকালে মাত্র জানিলাম যে তুমি মীরগঞ্জে মার্ব্বেল রকের কাছে আছ। আমি মনে ক'রেছিলাম সুধাকে আমি নিজেই লইয়া গিয়া তোমার হাতে সঁপিয়া দিয়া আসিব। বাড়ী ফিরে দেখি মেয়েরা মার্ব্বেল রক্ দেখিতে গিয়াছে। বিনোদ ও তোমার টেলিগ্রাম প্রায় এক সঙ্গেই এলো, তাইতে জানিলাম সুধা স্বয়ংই তোমার কাছে উপস্থিত হ'য়েছে। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এই মিলন নিশ্চয়ই তোমাদের অবিচ্ছিন্ন সুখের হইবে। বিনোদ এই চিঠি নিয়ে যাইতেছে, তারই সঙ্গে তোমরা দুজনে একবার এসো। সুধার পিসিমাও তোমাদের একবার একত্র দেখ্তে চাচ্ছেন, তা না হ'লে আমরাই তোমাদের কাছে যেতাম।

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীকালীপদ মিত্র।

সুধা এতক্ষণ দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল, এসকল কথার একটি অক্ষরও তাহার কানে হয়ত যায় নাই। সে আপনার এত বড় সৌভাগ্য কিছুতেই যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলনা, তাই সে হঠাৎ অর্দ্ধ অবিশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "যদি এ চিঠি বাবার লেখা না হয়;—" তাহার ঠোঁটে বাকী কথা আটকাইয়া গেল। সেটা বড় ভীষণ অপবাদ,—সহসা কাহাকেও দেওয়া যায় না।

সুধীর এবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল "এ বড় মন্দ মজা নয়! সুধা, তুমি প্রথম থেকে আমাকে যে মস্ত বড় একটা বদমায়েস বলে স্থির ক'রেছ, কিছুতেই দেখছি সেটা আর ভুলতে পারচোনা। তা তুমি বলতে পারো; কারণ আমাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পরিচয়টা বেশ ভাল রকমই আছে কিনা! আমিই কি তোমাকে এতক্ষণ আমার সুধা বলে মনে ক'রেছিলাম?—বরং মনে হচ্ছিল এ আবার কি গ্রহে পড়া গেল! আচ্ছা তুমি আমায় চেন না; কিন্তু"— বলিতে বলিতে সে দ্বার খুলিয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপরের রাইটিং কেশ হইতে অর্দ্ধ-লিখিত একখানা পত্র তুলিয়া লইয়া—আবার সুধার নিকটস্থ হইল। সেখানা তাহার সামনে ধরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার লেখাতো চেন? দেখ দেখি এ লেখাটা তোমার স্বামীর কি না?"

সুধা মাটী হইতে দৃষ্টি তুলিয়া কম্পিত কটাক্ষে তাহার প্রসারিত হস্তস্থিত পত্রখানার দিকে দৃষ্টি করিল। "প্রাণের সুধা!" এই তো সেই চেনা হাতের প্রিয় সম্বোধনটি! হায়! এ কি বিড়ম্বনা! এই অপরিচিত প্রাণীদ্বয়ই কি পরস্পরের চিরজীবনের সহায়? ইহারাই কি ইহাদের দু'জনের একমাত্র 'প্রণাধিক, প্রিয়তম!' সুধার লজ্জায় রাঙ্গামুখে একটু করুণার হাসি ফুটিয়া উঠিল। নভেলেও যে এমন প্রেমিক যুগলের কল্পনা দেখা যায় না! সুধীর কিন্তু এইটুকু প্রমান দিয়াই নিশ্চিন্ত হইল না, হাজার হউক সেওতো একটা ম্যাজিষ্ট্রেট্! বৈকালে প্রাপ্ত বম্বে হইতে রিডাইরেক্ট করা পত্রখানা নিজের বেড়াইবার কোটের পকেট হইতে বাহির করিয়া আনিয়া সুধার চোখের সাম্‌নে তেমনি করিয়া ধরিয়া বলিল—"চেয়ে দেখ দেখি সুধা, এ চিঠিখানা বোধ হয় তুমি তোমার স্বামী সুধীরকেই লিখে থাক্‌বে। অন্য কোন জালিয়াৎ সুধীরের হয়তো এটা পাবার সম্ভাবনা ছিল না?"

সুধার একবার ইচ্ছা হইল তাহার লেখা এই চিঠিখানা ইহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া কুটী কুটী করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে, ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা' এই যে অপরিচিতের প্রতি রাত্রের মধ্যে কত বারই অবিশ্বাস তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল ;—সেই অবিশ্বাসে যাঁহাকে সে অকথ্য অপমান পর্য্যন্ত করিতে দ্বিধা করে নাই, তাহার প্রতি এই লিপিখানি কত ভালবাসা, কত অভিমান-সোহাগই না বহন করিয়া আনিয়াছে? যাহাকে চোখে দেখিলে চিনিতে পারিবার মত এতটুকুও সঞ্চয় তাহার নাই, তাহাকে কি বলিয়া তাহার আপনার মনের সমস্ত সঞ্চয়টুকু সরল বিশ্বাসে সে উজাড় করিয়া দিয়াছে? এমন বোকা মেয়ে সে!

সুধীরের কথায় অভিমানে দু'ফোঁটা চোখের জল তাহার লজ্জারক্তিম গালের উপর ঝরিয়া পড়িল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া সুধীর তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে গেল। আবার হাতখানি সরাইয়া লইয়া হাসিয়া জিজ্ঞসা করিল—"কি সুধা এবার তোমায় আমি ছুঁতে পারিতো?"

সুধীর তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইতেই সে তাঁহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বড় সুখে বিজড়িত-অভিমানের কান্না কাঁদিয়া তাহার আলোড়িত বুকের বাহিরটা ভাসাইয়া দিল। তখন জানলার আশপাশ দিয়া উষাসতী তাহারই মত রাগরক্তিম মুখে উঁকি দিতে ছিলেন। ভোরের বাতাস গাছ'পালার উপর হইতে গত বৃষ্টির বারিবিন্দু নাড়া দিয়া তাহারই অশ্রুবিন্দুর মতন একটি একটি করিয়া ঝরাইয়া ফেলিতেছিল।

বাহির হইতে বিনোদ ডাকিয়া বলিল, "সুধীর সুধা উঠেছে? তার জন্য বড় ভাবনা হ'য়েছিল। তাকে একবার ডেকে দাও দেখি।"

সুধা মুখ তুলিল। সুধীর তাহার মৎলব বুঝিতে পারিয়া ডাকিল। তাহার একটি হাত ধরিয়া ফেলিল,—হাসিয়া ডাকিল,—"বিনোদ দা, তোমাদের সুধা আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রচে—বল্‌ছে আমি চিঠি জাল ক'রেচি। তুমি এ'সে আমায় বাঁচাও।"

ক'নে দেখা।

যখন আমি মেডিকেল কলেজের এম বি ক্লাসে ফিপ্‌থ ইয়ারে পড়িতাম তখনকার একদিনের একটা ঘটনা বলি শোন,—সে কথা শুনিলে তুমি আর তোমার ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়াকে কঠিন বলে কাঁদুনি গাহিতে বসিবে না। আমার বোধ হয় তেমন অশান্তিকর ঘটনায় তোমাদের কলেজের ছাত্ররা তো দূরে থাক—তাহাদের প্রিন্সিপাল নিজে শুদ্ধু কখনও পড়েননি। হাসচো? আমি বারণ করচিনে, তবে আমার কাহিনীটা শেষ হ'য়ে গেলেও যদি হাসতে পার,—তাহ'লে বরং বোঝা যাইবে। না ভাই আমার হৃদয় মোটেই দুর্ব্বল নয়। তা'হলে কি আর মেডিকেল কলেজের ডিপ্লোমা নিয়ে বেরুতে পেরেছি? দয়া মায়া ঘৃণা পিত্ত সব না ত্যাগ ক'রলে ডাক্তার হওয়া যায় না।

দুই চারিটা বাজে কথা না বলিলে কি গল্প বলা যায়? বিশেষ যে ছোট্ট আমার গল্পটি, একবারে যেন 'নটে গাছটি মুড়িয়ে' যাবে, না ভাই ওটা দম্ভের কথা! সত্য কথা বলিতে কি,—আমার মনটা এখনও ডাক্তার হইয়া উঠিতে পারে নাই। মরার উপর দিয়া অভ্যাস করিয়া যদিও আমি এখন জ্যান্তর উপরেও ছুরি চালাইতে পিছ্‌পা' নই, তবু আমার যা কিছু অত্যাচার তা এই দেহগুলোর উপরে,—তা নিজের ভিতরের যে জীবাত্মা তিনি এখনও গরীবের কাছে হাত পাততে নারাজ হননা—মাঝরাত্রে কলেরার রোগীর জন্য কাতর আহ্বান এলেও মাথা ধরেছে,—বলিতে গেলে মুখ তিনি চেপে ধরেন। মনের ভিতরে এখনও এই যে পাকা ডাক্তার হইয়া উঠিতে পারি নাই, এও হয়ত তাঁহারই শাসনে। তবে আশা আছে—ভিজিটের হার যেমনি বাড়িতে থাকিবে, দুই থেকে জোড়া সিঁড়ি টপ্‌কে যেমন উপরের

প্রমোশন পাইতে থাকিব, অমনি এ সব অভ্যাসও দুরস্ত হইয়া যাইবে। এখন দেখা যাক এ যে,—তোমার ওই হাতুড়ি পেটা হাত দু'খানার মত মনটার কতখানি উন্নতি হইয়াছে!

সেও খুব বেশী দিন নয়—মার্চ্চ মাস সেটা। শনিবার, বেলা প্রায় তখন চারটে, কুমুদদাদা ও আমি একটা পচা মড়াকে ঘেঁটে ঘেঁটে তার স্নায়ুজালের বিশ্লেষণ ক'রে আধ ঘণ্টা মাত্র হাত ধুয়ে বাইরে একটু বেরিয়ে এসেছি.—মার্চ্চ মাসের বিকেল শুনে তোমার মনে বেশ একটুখানি আশা জমে উঠেছিল, না? কিন্তু হায়! কাল অনুকুল থাকিলেও স্থান মোটেই অনুকুল ছিল না,—আর পাত্র—অবশ্য আমার মতে যথেষ্ট অনুকুলই ছিল; তবে তোমারা পাঁচজনে যা বল!

নীল আকাশের তলায় পুঞ্জ পুঞ্জ লক্ষ্যহীন মন্থরগতি সাদা মেঘের স্তর সূর্য্যের আলোয় বিদ্যুতের মত জ্বলিতেছিল, রাস্তায় গাড়ি ও লোক চলাচলের বিরাম ছিল না, কুলপিওয়ালা—আরও কত কি—ফেরিওয়ালারা হাঁকিতেছিল। নদীর স্রোতের মত জনস্রোত মহানগরীর বুকের উপর দিয়া তরঙ্গিত হইতেছিল। হিন্দু হোষ্টেলে থাকি, সেখানকার ছোঁয়াচ লাগিয়া পূর্ব্বে একবার কবিতা রোগের সূত্রপাত হয়, এখন রোগ একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু রোগ যে স্থানটাকে আক্রমণ করে সেখানটাকে যেমন একটুখানি দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়া যায়—তেমনি সেও আমার মনের নিভৃত প্রান্তটাকে একটুখানি চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। পদ্য আর কোথাও থাক না থাক, আমি যে যেমন তেমন একটি স্ত্রী মনের মধ্যে লইয়া তাড়াতাড়ি ঘরকন্না পাতিয়া বসিব—তাহা আমার মন মানিতে চাহিত না। বিশেষ ডাক্তারি পড়িতেছি, শরীরতত্ত্বের অনেক কথাই জানাশোনা হইয়া গিয়াছে, কারাগারে বদ্ধ, বাড় বৃদ্ধি হীন, একটা দশ বছরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া যে, তাকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় কুইনিন্ পিল গিলাইতে রাত জাগিব সে সাধ ছিল না। অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া

অবশেষে বন্ধুর দ্বারায় এক সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলাম। তাঁহারা খুব বড়লোক, মেয়েটীর বয়স নাকি সাধারণ ক'নের হিসাবে যথেষ্ট বেশী,—মেয়ের মাতৃধন অগাধ! এই খবরটুকু ইহার মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা সুখবর। আমারও মনের ইচ্ছা বিবাহ করিয়া স্ত্রীর অর্থে বিলাত হইতে নাম কিনিয়া আসি। মনের সঙ্গে মিলিল।

সেদিন মেয়ে দেখিতে যাইবার কথা ভাবিতেছি,—এইবার বাসায় গিয়া গায়ে সাবান ঘসিয়া, এসেন্স মাখিয়া বাহির হইয়া পড়ি,—এমন সময় অ-দূরে পাল্কী বেহারাদের হেঁইও, হেঁইও, শব্দ শুনিতে পাইয়া চাহিয়া দেখিলাম,—বাহকগুলা পাল্কীখানা লইয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবেই আমাদের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। বড় একখানা যুড়ি হইতে নামিয়া তুইটি বাবু এক রকম ছুটিয়া কলেজের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কুমুদদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার?"

আমিও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম, নিজের কাজটায় হয়ত বাধা পড়িতে পারে ভাবিয়া অপ্রসন্নচিত্তে বলিলাম "খুব সহজ তো মনে হচ্চে না।"

সত্য সত্যই ব্যাপার একটু গুরুতর! পাল্কিখানা দেখিয়া আত্মঘাতিনী, কি আত্মঘাতি—এইটুকু স্থির করিতে পারি নাই। এখন যাহা দেখিলাম তাহা নভেলেই শুধু দেখা যায়,—চক্ষে কখন দেখি নাই! সৃষ্টিকর্ত্তার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির পূর্ণবিকাশ-স্বরূপা এই আত্মঘাতিনী মেয়েটি—একটি বাসি ফুলের মতই পরিম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি তেমনই সুন্দর! সুবেশ সজ্জিতা এই কিশোরীকে বিসর্জ্জনের প্রতিমাখানির মত দেখাইতেছিল।

পরীক্ষায় তখনও প্রাণ আছে বলিয়া জানিতে পারা গেল, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সেই ভদ্রলোক তুইটি সাহেবের পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে একজন শোকে তুঃখে একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন।

অনেকক্ষণ পরে রমণীর একটুখানি চৈতন্য হইল, সে তখন স্খলিত জড়িত কণ্ঠে ডাকিল—"অখিল।" আমাদের বাহুমূলে তাহার আতপ-তপ্ত লতাগাছির মত দেহখানি ক্রমাগত তন্দ্রাজড়িত অবসাদে শিথিলভাবে লুটাইয়া পড়িতেছিল, একবার সে অর্দ্ধমুদিত নেত্র পূর্ণবিকাশ করিয়া সাগ্রহে আমার দিকে চাহিল ;—একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া আবার চোখ বুজিল ; আবার চাহিয়া দেখিল, তারপর সহসা সকরুণ মিনতির সহিত মৃদুস্বরে কহিয়া উঠিল—"আমায় ছেড়ে দেন, আমি একটু ঘুমাবো।"

বলিতে বলিতে তাহার সর্ব্বশরীর যেন মহা ঘুমঘোরে ভাঙ্গিয়া আসিল, আমার নিজের কাজ বন্ধ করিলাম না। সাহেব নিকটস্থ হইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার বিষণ্ন গম্ভীর মুখ আরও স্থিরভাব ধারণ করিল,—"আশাহীন" এম্‌নি একটা কথা তাঁহার দুই চোখের দৃষ্টি স্পষ্টই বলিয়া দিল। রমণী আবার আমার দিকে তন্দ্রাবিষ্ট নেত্র ফিরাইল "ছেড়ে দেন,—আমি ঘুমাবো—আর পারিনে।" কি কাতর মিনতি! ইহার পর তাহাকে কষ্ট দিতে যেন আমাদের বাহু উঠিতেছিল না। ডাক্তার সাহেব বৃদ্ধ লোকটিকে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এর অর্থ কি মিঃ গুপ্ত? আমাদের প্রিয় দুহিতা চন্দ্রার আজ এ অবস্থা কেন?"

মিঃ গুপ্ত! চন্দ্রা! একি শুনিলাম! আমার কম্পিত অধর ভেদ করিয়া অজ্ঞাতে কখন জানিনা বাহির হইয়া পড়িল—"চন্দ্রা!" চমকিয়া রমণী আমার মুখের দিকে দুই চক্ষু বিস্তৃত করিয়া চাহিল ;—কিন্তু পরমূহুর্ত্তেই যেন সেই দুটি প্রভাহীন কালো চোখে ব্যথিত ভৎ সনার সহিত হতাশা তীব্রবেগে ফুটিয়া উঠিল। যেন সে কহিল,—"এই মরণোন্মুখী অবলার সহিত প্রতারণা সাজে?"

কে জানে কেন বড লজ্জানুভব করিলাম।

অকস্মাৎ সুন্দরীর অবশ মস্তক সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল, একটা গভীর

নিশ্বাস—দুই হাতে মুখখানা তুলিলাম—নিদ্রাকাতরা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে!

আমরা রোগীকে শোয়াইয়া দিতেই তাহার পিতা মিঃ গুপ্ত সহর্ষে কহিয়া উঠিলেন—"আর বুঝি কোন ভয় নাই?" দ্রুতপদে কন্যার নিকটস্থ হইতে হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে কহিতে লাগিলেন,—"ফিরে আয় বাছা আমার! অখিলকে আমি আজই ফিরিয়ে নে' আসবো আট বৎসর ধরে তাকে ঘরে রেখে—তোমার সঙ্গে বিয়ে দোব বলে আশা দিয়ে এসেছি—হঠাৎ কি মতিচ্ছন্ন হ'লো 'বয়কটে' যোগ দেছে বলে—তাকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্য পাত্র স্থির করলুম, তুমি যে সাবিত্রীর মত তাকেই মনে মনে বরণ করেচ তা'তো ভাবিনি,—ডাক্তার একি! মায়ের আমার সর্ব্ব-শরীর এত ঠাণ্ডা কেন?"

নতমুখে আমাদের শিক্ষক কহিলেন—"মিঃ গুপ্ত! এখন ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আমাদের প্রিয় দুহিতার আত্মার কল্যাণার্থে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করাই সঙ্গত—"আকস্মিক বজ্রাঘাতের মত নির্ঘাত সংবাদ সদ্যসন্তানহারা পিতাকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। বহুক্ষণ পরে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে স্প্রীংয়ের মত চমকাইয়া ফিরিলেন—"বলেন কি মহাশয়! কার আত্মার? আমার চন্দ্রার? সে তবে সত্যি আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গ্যাছে? চন্দ্রা মা'রে!"

ভীষণ মেডিকেল হল যেন ভীষণতর হইয়া উঠিল। প্রাণহীনা কন্যার পার্শ্বে শোকদীর্ণবক্ষ পিতা মুমূর্ষুবৎ পতিত, আমাদের মত শিক্ষার্থী হইতে মৃত্যু-সহচর শিক্ষকগণ পর্য্যন্ত সকলেই গভীর বেদনাস্তব্ধ বক্ষে সেই বিগত-প্রাণা অভিমানিনীর কমনীয় মুখের প্রতি বদ্ধ দৃষ্টি, রাজপুত সতীর মতন সে যেন আগত বিপদের ভাবনায় নিজেকে জহর-ব্রতের অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দান করিয়াছে! গৃহের বাতাসে বাহিরের ঝাউ গাছের পল্লব-মর্ম্মর শোকের নিশ্বাস বহিয়া যাইতেছিল। আমার বক্ষের মধ্যে অব্যক্ত যন্ত্রনায় আকুল ক্রন্দন যেন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল। এই অতুলনীয় প্রতিমা

কি এই কুৎসিত ভীষণ স্থানে এমন অলস দেহে ঘুমাইয়া পড়িবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল? তুমি ফিরে এসো সতি! তোমার ঈপ্সিত লাভে ধন্য হও, সুখী হও, তুমি—হতভাগ্যকে কেন এমন করিয়া এ আত্মোৎসর্গে জড়িত করিয়া গেলে?"

সহসা সেই শোকাগারে স্তব্ধ আমাদের মাঝখানে,—আর এক ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল। মুহ্যমান মিঃ গুপ্ত তাহাকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু সে ব্যক্তির প্রখর দৃষ্টি চারিদিকে ফিরিয়া শেষ পিতার উপরেই পতিত হইল। কোনদিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া সে সশব্দচরণে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কহিয়া উঠিল,—

"একবার শেষ দেখা দেখতে এসেছি,—এতে আপনার অপমান হবে নাতো? আট বছর ক্রমাগত দুজনের কানে যে মন্ত্র দিয়েছিলেন, এক দিনে তাকি ভোলান যায় মশাই? শুধু এই কথাটি বলতে এসেছি,—বেশীক্ষণ থাকচিনে।"

মিঃ গুপ্ত মাথা তুলিয়া আগন্তুকের দিকে চাহিলেন, তাঁহার বিষাদাচ্ছন্ন মুখে বিষাদ মেঘ ঘনীভূত হইল, অত্যন্ত শোকপূর্ণ মৃদুস্বরে কহিলেন—"কে অখিল এসেছ, দেখে যাও সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতেও আমার বিলম্ব হয়নি, মা আমার সতীলোকে চলে গ্যাছেন!"

আগন্তুক করতালি দিয়া উচ্চৈস্বরে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—সে হাসি আমাদের এ কক্ষও বোধ করি কখন শুনে নাই! গৃহস্থিত সকলেই আকস্মিক ভয়-বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। অখিল চন্দ্রার মুদিত কমলবৎ মুখের উপরে দৃষ্টি স্থির করিয়া ভীষণ স্বরে কহিল,—"আমি মনে করেছিলাম প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী বাপের মেয়ে তুমিও নিজের প্রতিজ্ঞা ভুলে যাবে, ক্ষমা করো চন্দ্রা! বেশ ক'রেচ চলে গ্যাছ!" উন্মাদ চীৎকার করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

এ দৃশ্যের এইখানেই উপসংহার!—বলিবার আর কিছুই নাই। হৃদয়বিদারক দৃশ্য হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া স্মৃতির ছাপ মারিয়া রাখিয়া গিয়াছে। বলিতেছ—আমি প্রেমে পড়িয়াছিলাম? নহিলে এ পর্য্যন্ত বিবাহ করিলাম না কেন?

রক্ষাকর! আর ও সাধ নাই বাপু! সুখের চেয়ে স্বস্তি ঢের ভাল। কে জানে কখন কার নবীন জীবন সরোবর এ রত্নাকরের চোখের দৃষ্টিতে শুখিয়ে উঠবে? দত্ত কবির সেই কবিতাটা মনে পড়ে? তোমাতে আমাতে ফাষ্ট ইয়ারে পড়বার সময় গোলদীঘির ধারে বসে আওড়াতুম 'প্রেমের নিগড় গড়ি চরণে পরিলি সাধে, কি ফল লভিলি? জ্বলন্ত পাবক শিখা লোভে তুই কাল ফাদে উড়িয়া পড়িলি।"

আমার চোখে জল কেন? কেন তোমায় কি বলিনি ক'মাস থেকে চোখে কি একটা ব্যারাম হ'য়েচে। বাগ্‌চি মশাইকে একবার দেখাতে হবে দেখচি! তবু যদি তুমি এমন জোরের সঙ্গে বলতে থাকো যে, আমি সেই আত্মঘাতিনী মৃত্যু-মুখী কুমারীকে ভাল বেসেছিলাম,—আর এ যদি সম্ভব হয়,—তবে তাই।

মথুরায়।

১

"সত্যি তবে তোমার এই মাসেই বিয়ে হবে ?"

"হ্যাঁ, ভাই, এ শ্রাবণ মাসেই হবে শুনচি, তোর কবে বিয়ে হবেরে— মতিয়া ?"

একদিন বর্ষাকালের সন্ধ্যাবেলায় যখন নীল আকাশের কোথায়ও একটু মেঘশূন্য ছিলনা,—যখন কূলে কূলে ভরানদী তুধারের শষ্যক্ষেত্রের উপর ফুটন্ত কটাহপূর্ণ তুগ্ধের মত উথলাইয়া উথলাইয়া পড়িতেছিল,—যখন আসন্ন বন্যার হাত হইতে রক্ষা করিবার আশায় চাষারা সশঙ্কিত দৃষ্টি নদীর প্রত্যহবর্দ্ধিত জলের প্রতি নিক্ষেপ করিতে করিতে রাশি রাশি ভূট্টা ও মাড়ুয়ার গাছ গরুর গাড়ীতে বোঝাই দিতেছিল,—সেই সময় বাঘমতীর তীরে বসিয়া পিত্তলের কলসী মাজিতে মাজিতে একটী বালিকা তাহার বালক সঙ্গীকে এই প্রশ্ন করিল। রঘুনাথ গাছভাঙ্গা টাট্‌কা ভূট্টা শিকে বিঁধাইয়া চাষাদের তামাকু খাইবার 'ঘুরে' তাহা পোড়াইয়া আনিয়াছিল। মতিয়ার জন্য ইহারই কিছু অংশ কোঁচড়ে রাখিয়া সেই গরম গরম ভূট্টা পোড়া বিনা লবণেই উদরস্থাৎ করিতে করিতে মতিয়ার নিরুত্তম মুখের দিকে চাহিয়া সগর্ব্বে বলিল,—"সব্বাই বলচে আমার যে বউ হবে সে ভাই খুব সুন্দর, আর খুব নাকি সে লেখা পড়া জানে, তারা খুব বড়মানুষ আর সহুরে কি না,—বিয়ের সময় আমাকে কত গহনা দেবে, কত কি দেব,—খুব মজা হবে না ভাই, তোর খুব আহ্লাদ হচ্ছে না ?" মতিয়া মুখ ফিরাইয়া জোরে জোরে কলসী মাজিতে মাজিতে ভগ্নকণ্ঠে কহিল—"তোমার বিয়ে হ'লে আর কিনা তুমি আমায় কিছু দেবে ?

পেয়ারা টেয়ারা সব এবার থেকে বউকেই না দিয়ে দেবে,—আমার ভাই কেমন ক'রে আহ্লাদ হবে ?"

রঘুনাথ একটা ভূট্টা শেষ করিয়া দ্বিতীয়টায় মনঃসংযোগ করিতেছিল, সে হাসিয়া উঠিয়া পরিত্যক্ত ভূট্টার "নেড়াটা" অভিযোগ-কারিনীর প্রতি ছুঁড়িয়া মারিল ও সকৌতুকে বলিয়া উঠিল, "দুর ! বউকে বুঝি আমার লজ্জা করবে না ? বউএর সঙ্গে বুঝি আমার কথা কইতে আছে ? পেয়ারা টেয়ারা সব ভাই তোকেই দোব, খালি একটা বৌ হবে, আর গয়না টয়না হবে—বেশ হবে না !"

ঈর্ষাগম্ভীর মুখ প্রফুল্ল করিয়া মতিয়া প্রতিশোধস্বরূপ এক আঁজলা জল সঙ্গীর গায়ে ছুঁড়িয়া দিল। রঘু কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিল,—"পোড়ারমুখী, আমার কাপড় টাপড় ভিজিয়ে দেওয়া হলো! দাঁড়া তো তোকে দেখাচ্চি মজা !"

২

রঘুনাথের বিবাহ হইল সহরে। তাহার শ্বশুর কলিকাতা য়ুনিভারসিটির উপাধিধারী জজকোর্টের একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন উকিল। চাল চলনেও অনেকটা তিনি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই জন্য কাছাকাছির লোকেরা কেহই তাঁহার কন্যা গ্রহণে সম্মত হয় নাই। মধ্যে শিবশঙ্কর একবার একটি শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবককে কন্যাদান করিয়া বাঙ্গালী বেহারীর সম্মিলনের পথে ঈষৎ অগ্রসর হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এ মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইল না। এই সংবাদে শিবশঙ্করের জ্ঞাতি বন্ধুগণ একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপেই পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, এবং তাঁহার বৃদ্ধা পিতামহী অন্নজল ত্যাগ করিয়া শয্যাগত হইলেন। সংসারে অনেক শুভ সংকল্প এমনই করিয়া স্বজনের রোষানলে ভস্মীভূত ও তথাকথিতগণের

অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতে নিত্যই দৃষ্ট হয়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অবশেষে শিবশঙ্কর দূরগ্রামস্থ জমিদার গোপীনাথ তেওয়ারির অশিক্ষিত কিশোর পুত্র রঘুনাথের হাতে তাঁহার শিক্ষাপ্রাপ্তা ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা চন্দনকুমারীকে সমর্পণ করিয়া অবিমৃষ্যকারিতার ফলভোগস্বরূপ অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। মেয়ে শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়াই ললাট ও সিঁথিলিপ্ত সিন্দুর মুছিয়া শ্বশ্রূর শতদিব্য দেওয়া আ-বাহু 'লাঠিয়া' ভাঙ্গিয়া, পায়ের তোড়া পাঁইজোর খুলিয়া, রাগিয়া কাঁদিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, সেই অসভ্য, অশিক্ষিত, অপরিচ্ছন্ন শ্বশুরগৃহের শাসন-বন্ধনের মধ্যে ধরা দিতে সে এ জন্মে আর কখনও সেখানে যাইবে না। অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে পিতাকে গিয়া নালিস করিল—"বাবা আমাকে তবে কেন তুমি লেখাপড়া শিখিয়েছিলে?" মাকে বলিল "মাগো তাদের মাটির বাড়ী, দড়ির খাটিয়া, সে ঘরে কি আমি থাকতে পারি? আর একদিন থাকলেই আমি মরে যেতুম! আর কখনও সেখানে আমি যাচ্ছি না।"

শিবশঙ্কর দেখিলেন মেয়েকে উপযুক্ত পাত্রে দিতে না পারিয়া বড় সঙ্কটই করিয়াছেন। বেহাইকে লিখিতে লাগিলেন—"রঘুনাথের লেখাপড়া শেখার বিশেষ প্রয়োজন, তাকে আমার কাছে পাঠান।"

প্রথমটা গোপীনাথও একমাত্র পুত্রের বিরহ সহ্য করিয়া তাহার উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দিতে সম্মত হন নাই। অবশেষে ভালমানুষ বেচারী বিজ্ঞ বৈবাহিকের যুক্তি গ্রহণ করিয়া পুত্রকে তাহার শ্বশুরগৃহে পাঠাইতে রাজী হইলেন। রঘু এ সংবাদ শুনিয়া যতটা খুসী হইল তাহার মা ও মাতামহী ঠিক সেই পরিমানে অসন্তুষ্ট হইলেন। রঘুর মা রাগিয়া বলিলেন, "সহরের ডাকিনী ঘরে এনে এই হলো! যখন দেখেছি বউ ফিরিঙ্গী মেমেদের মতন খোঁপা বাঁধে, বাঙ্গালীন্‌দের মতন সাড়ী পরে, খড়কে দিয়ে সিঁথিতে সিঁন্দুর লাগায়, তখনি জেনেছি বাছার

আর আমার মঙ্গল নেই! ছেলে আমি ছেড়ে দেবো না।” কিন্তু তাঁদের সে দুর্ব্বল যুক্তি টিকিল না। গোপীনাথের কুটীরে একদিন তাঁহার সহরবাসী সুসভ্য বৈবাহিকের পদধূলির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অসভ্যা পুরবাসিনীদের নিতান্ত অসহ্য মরাকান্নার মধ্য দিয়া রঘু শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল। বৈবাহিকের “অভ্যর্থনার সখের গালি” তাঁহার মস্তকে অজস্র অভিশাপের ধারার মতন পশ্চাৎ হইতে বর্ষিত হইতে লাগিল। এই সব ব্যাপারে রঘুর উৎসাহ ও আনন্দের প্রথম আবেগে ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে তাহা মতিয়ার অশ্রুম্লান করুণ দৃষ্টিতেই ঈষৎ প্রতিহত হইয়া আসিয়াছিল। দ্বারের পিছন হইতে সে মুখ বাড়াইয়া অজস্র ধারার ক্ষীনদৃষ্টি নিঃশব্দে রঘুনাথের মুখে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিল। শ্বশুরের হাত ছাড়াইয়া রঘু নিকটে আসিয়া দুই হাতে তাহার মুখখানি আদরের সহিত ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিল, “কাঁদিস্‌নে মতিয়া, আবার আমি খুব শীঘ্র আসবো, আবার আমাদের খেলা হবে, মাছ ধরা টরা সবই হবে। ভাই তুই অত ক’রে কাঁদিস নে।”

কিন্তু এ সান্ত্বনায় মতিয়ার অমঙ্গল-ভীত ব্যাকুল চিত্ত সুস্থির হইল না। সে দ্বিগুণ বেগে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, “না রঘুয়া, তুমি যেও না। বউ তোমায় আর এখানে আস্‌তে দেবে না,—তখন কি হবে রঘুয়া,—তুমি যেও না।”

রঘুনাথ সদম্ভে বলিয়া উঠিল, “ঈস্‌ বউ আমার সঙ্গে জোরে পারবে কি না! তুই কেন তাকে অত ভয় করিস্‌ বল্‌তো? বউ খেলাটেলা জানে না, খালি বসে বসে বই পড়ে, তার সঙ্গে কিছুতে আমার মিল হবে না। আমি সহর টহর সব দেখে শুনে নিয়ে ঠিক চলে আসবো। দেখিস্‌ তখন!”

রঘুনাথ দুচার দিনের মধ্যেই বুঝিল যে, এ সহরের চেয়ে তাহার গ্রাম্য-জীবন শতাংশেই ভাল ছিল। সেই গাছে গাছে পেয়ারা আম ও জাম

পাড়িয়া বেড়ান, জলে পড়িয়া দু তিন ঘণ্টা নদী উলোট পালট করিয়া সঙ্গীগণের সহিত সাঁতার কাটা, তীরে বসিয়া মাছধরা, ভূট্টাক্ষেত হইতে তাজা ভূট্টা ভাঙ্গিয়া সদলবলে আনন্দ-ভোজন, পাখীর বাসা হইতে শাবক ও চাষীর ক্ষেত হইতে শশা চুরি, অবাধ স্বাধীনতার সহিত উদ্দাম মুক্ত বিচরণ, সব চেয়ে আর—বাল্যসঙ্গিনী মতিয়ার সহিত খেলা-ধূলা ও বিবাদ-কলহ। এ সকলের পরিবর্ত্তে বন্দীর মতন জনমুখরিত নগরীর মধ্যবর্ত্তী বন্দীশালার ন্যায় একটি মাত্র গৃহে বাস, নিয়মিত পরিমিতাহারান্তে গাড়ি চাপিয়া স্কুলে গমন, প্রাতে সন্ধ্যায় কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের নিকট তিরস্কৃত হইতে হইতে অনিচ্ছা কাতর চিত্তে পাঠাভ্যাস এবং রাত্রে মিতভাষিণী শিক্ষিতা স্ত্রীর সঙ্গ এই সব কয়টায় মিলিয়া তাহাকে যেন মর্ম্মের মধ্যে পীড়ন করিতে লাগিল। বনের হরিণকে গৃহে আনিলে সে যেমন কিছুতেই পোষ মানিতে চাহে না, গ্রাম্য বালকের স্বাধীন চিত্ত তেমনি পরাধীনতার কঠিন নিগড়ে বদ্ধ থাকিয়া দিন দিন হাঁফাইয়া উঠিতেছিল। তাই রঘু সকলকার আদর স্নেহ ও একান্ত সাবধানতার ভিতর থাকিয়াও দিন দিন মনের স্ফূর্ত্তি ও শরীরের বল হারাইতে লাগিল। এত যত্ন এত আগ্রহ জামাইএর মনকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া শিবশঙ্কর ও তাঁহার পত্নী নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, প্রতিবেশিনী একজন বঙ্গমহিলা শুনিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "'জন জামাই ভাগ্‌না, তিন নয় আপনা।' তা কি করবে দিদি, ও রকম হ'য়েই থাকে।" চন্দনও স্বামীর অন্যমনস্কতা দেখিয়া অনেক সময় রাগ করিয়া দু'চার কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িত না, মধ্যে মধ্যে নিজেও অভিমান করিয়া কথা বন্ধ করিত, কিন্তু তাহাতেও স্বামীকে অবিচলিত দেখিয়া শেষে নিজেই যাচিয়া আবার কথা কহিত। কারণ মুখরা বালিকা মুখবন্ধ করিয়া থাকিতে পারিবে কেন? তাহার বুকে হাঁপ ধরে যে।

অবশেষে একদিন আর থাকিতে না পারিয়া রঘু শ্বশুরকে মুখ ফুটিয়া বলিল, "আমি বাড়ী যাবো।" শিবশঙ্কর আদর করিয়া বলিলেন, "কেন বাবা এখানে কি কোন কষ্ট হচ্চে ?" রঘু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ।" শিবশঙ্কর দুঃখিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কষ্ট হয় বলো, আমি যাতে কষ্ট না হয় তাই ক'রে দেব।" রঘু একটুখানি ভাবিয়া মাথা নাড়িল, "না আমি বাড়ী যাবো, আমার মা বাবা আর মতিয়ার জন্য বড় মন কেমন কর্‌চে, মতিয়া যে আমায় শিগ্‌গির ক'রে যেতে বলেছিল"—এই উল্লেখের সঙ্গেসঙ্গেই রঘুনাথের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। শিবশঙ্কর একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মতিয়া কে? আমি তো কই মতিয়াকে দেখিনি!" রঘু চোখ মুছিতে মুছিতে সবিস্ময়ে কহিল, "সেকি আপনি মতিয়াকে দেখেন নি?"—পরে একটু ভাবিয়া বলিল—"সে একজনদের একটি মেয়ে—ছোট্ট, আমার চেয়েও ছোট্ট,—আমি তাকে খুব ভালবাসি। সেও আমায় ভালবাসে। সে খুব ভাল। চন্ননের মতন কুঁদুলে নয়"—

শিবশঙ্কর একটু আশ্বস্তভাবে কহিলেন, "কেন চন্নন কি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে, নাকি? বড় অন্যায় তো! ছেলে মানুষ কিছু বোঝে না। তা আমি বারণ ক'রে দেব এখন।" রঘু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "ছেলে মানুষ! হ্যাঁ বড্ড তো ছেলে মানুষ! আমার ওকে একটুও ভাল লাগে না। আমি বাড়ী যাবো। মতিয়া ওর চাইতে কত ভাল!"

শিবশঙ্কর বিব্রত হইয়া উঠিলেন, চিন্তা করিয়া কহিলেন "আচ্ছা, তোমার বাবাকে চিঠি লিখি আগে, তিনি বলেন তো পাঠিয়ে দেবো।" শিবশঙ্কর কন্যাকে ডাকিয়া কিছু উপদেশ দিলে সে রাগিয়া গেল। দুম দুম করিয়া রঘুর পড়িবার ঘরে আসিয়া চোখ মুখ লাল করিয়া তীব্র-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"আমার নামে বাবার কাছে লাগান হ'য়েচে! কেন আমি তোমার কি ক'রেছি?"

রঘু চন্দনকে মনে মনে ভয় করিত, তাই থতমত খাইয়া গিয়া সে ভীতভাবে উত্তর দিল—"তুমি তো আমার সঙ্গে কেবল ঝগড়া কর, তাই বলেছি বৈ তো না। আরতো কিছুই বলিনি।"

"আর বলবেই বা কি? বলতে বাকিই বা কি রেখেছ? জানি জানি আমার কথায় তোমার গায়ে ফোস্কা পড়ে কিনা, মতিয়ার কথা খুব মিষ্টি, তাতে যেন তোমার অঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি হয়, না? কেন বলোতো তুমি মতিয়া মতিয়া করে চব্বিশঘণ্টা হেদিয়ে পড়?" রঘু সরলচিত্তে দ্বিধাহীন ভাবে কহিল, "আমি যে তাকে ভালবাসি—"

"কি? তুমি তাকে—সেই ছোটলোকের মেয়েটাকে—ভালবাসো? আর আমায় তুটি চক্ষে দেখতে পারোনা! সেই যত ভাল—আর আমিই যত মন্দ? আচ্ছা আচ্ছা দেখা যাবে আমি আর কখ্খনো তোমার সঙ্গে কথা কবোনা তো।"

রঘু ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিল, "তুমি শুধু শুধু বড্ড ঝগড়া করতে ভালবাসো, তাইতো আমি তোমায় তার মতন ভালবাসিনা। ছোটলোক হ'লে বুঝি তাকে আর ভালবাসতে নাই? বা, বাঃ বেশতো কথা! তুমিও তো ছোটলোক,—তোমাকে তবে সবাই তোমাদের বাড়ীতে কেন ভালবাসে? তার বেলাতেই বুঝি যত দোষ! তুমি তাকে তুচক্ষে দেখতে পারো না, সেই বা তোমার কি ক'রেছে?"

"কি! তুমি আমায় ছোটলোক বল্লে? যাচ্ছি দাঁড়াও মার কাছে।" চন্দন কাঁদিয়া কাটিয়া কুরুক্ষেত্র করিল। মার কাছে নালিস করিয়া—পিতার কাণে উঠাইয়া তারপর কিছুক্ষণ পরে আবার নিজেই আসিয়া স্বামীর সহিত যাচিয়া ভাব করিল। রঘু সে দিনকার হাঙ্গামার পর হইতে ভয় পাইয়া মতিয়ার নাম চন্দনের সম্মুখে বড় একটা করিত না। কিন্তু তাহার এ অনর্থক অত্যাচার ভিতরে ভিতরে তাহাকে সর্ব্বদাই পীড়ন করিতে লাগিল।

৩

তারপর ছয় বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রঘুনাথ এখন আর অসভ্য অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে বালক নয়। তাহার এলবার্ট টেরি, সিল্কের পাঞ্জাবী ও ভূলুণ্ঠিত উড়ানির বাহার দেখিয়া সেই রূপার পদক ও সোনার পাত মোড়া মোটাসোটা বালা পরা হৃষ্টপুষ্ট গ্রাম্য রঘুর কথা কাহারও আর মনেও পড়ে না। তাহার দেহ ও রুচির সহিত বুদ্ধি জ্ঞানও অনেকখানি মার্জ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাড়ীর কথা আর তার বড় একটা বোধ করি মনেও নাই,—কখন কখন মনে পড়িলেও সেখানের উপর আকর্ষণটা বড়ই কমিয়া গিয়াছিল। পিতা দু'তিন বার লইতে আসিয়া পুত্রের অনিচ্ছা দেখিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। শ্বশুরও জামাতার সেখানকার মাটির ঘরের 'সেঁতান' লাগিয়া পাছে অসুখ বিসুখ করে এই ভয়ে যাইতে দিতে সম্মতও নহেন। সেখানের খারাপ বাড়ী, মোটা চাউলের ভাত, ফিল্টার না করা জল, এই সকল রোগ বীজানুপূর্ণ বস্তুর মাঝখানে জীবন যাপনে পাঠান যে বড়ই দুঃসাহসের কাজ!

কিন্তু হায়! এবার দৈব গতিকে পুরা বর্ষার সময়েই রঘুনাথকে কিন্তু সস্ত্রীক বাড়ী আসিতে হইল!—হঠাৎ সাত দিনের জ্বরে রঘুর পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। সঙ্গে কচি ছেলে তাহার ঠাণ্ডা লগিবার ভয়ে,—স্পিরিট ষ্টোভ হরলিক্‌স্ মিল্ক এরোরুট বিস্কুট প্রভৃতি সঙ্গে থাকা সত্বেও খাদ্যাভাবে এবং সেই সেঁৎসেঁতে বাড়ী দড়ির খাটিয়া শাশুড়ীর দিনরাত কান্নাকাটী আত্মীয়বর্গের হা হতাশ—তাহার উপর আবার জানোয়ারের মতন অসভ্য লোকগুলার তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার সকৌতূহল আগ্রহ, এই সকল বিবিধ কারণে চন্দনকুমারী এ কয়দিনেই মনে মনে জ্বালাতন হইয়াই উঠিল এবং তাহাকে এমন জায়গায় সঙ্গে করিয়া আনা যে রঘুনাথের নিতান্তই অর্ব্বাচীনতা হইয়াছে তাহা অসন্তোষের

সহিত প্রকাশ করিতেও সে ত্রুটী করিল না। রঘুর মা এতদিন পরে ছেলেকে কাছে পাইয়া দুঃখে অভিমানে কাঁদিয়া ভাসিতে লাগিলেন। কিন্তু বধূর ভয়ে তাহাকে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে সাহস করিলেন না। তিনি বিলক্ষণ বুঝেন যে এ ছেলেটি আর তাঁহার নিজের সেই স্বধন নয়,—এটি এখন ঐ সুসভ্য মেয়েটির স্বামী!

যথা সময়ে শ্রাদ্ধ প্রভৃতি হইয়া গেল, সস্ত্রীক রঘুনাথ ফিরিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কৃপণ পিতা অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। এবার রঘুনাথ শ্বশুরালয়ের নিকটেই পৃথক বাড়ী ভাড়া লইবে তাহারও সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। একথা শুনিয়া আর রঘুর মা বুঝি লোভ সামলাইতে পারিলেন না! অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়াই তাই ঝাঁ করিয়া বলিয়া বসিলেন, "তবে আমাকেও নিয়ে চলনা বাবা, এখানে আর কাকে নিয়ে আমি থাকবো?" ভগবানের কৃপায় কি অভিশাপে—তাও ঠিক বলা যায়না—তিনি ঐ একটি বই আর সন্তান গর্ভে ধারণ করিতে পারেন নাই।

রঘু উত্তর করিল "বেশ তো মা! চলোনা।"

কিন্তু চন্দন একথা শুনিয়া রাগ করিতে লাগিল, বলিল—"তা তুমি আর তোমার মা ঐ বাড়ীতে থেকো, আমার এতদিন যেখানে ঠাঁই হ'য়েছিল সেই বাপের বাড়ীতেই একটু স্থান হবে। ওঁর রকম সকম দেখে যে সেখানে সবাই হাসবে—সে আমার মাথা কাটা যাবে। মাগো শ্বাশুড়ীর যা শ্রী! আমাদের বাড়ীর দাই চাকরানীরাও যে ওর চাইতে ভাল! আমি বাপু ওঁর সঙ্গে কিছুতেই থাকতে পারবো না।" রঘু একটু কুণ্ঠার সহিত মাকে যথাকালে জানাইল—সে বাড়ীতে ঘর বড়ই কম,—তা তিনি গেলে না হয় সে নিজে নীচের ঘরে শয়ন করিয়া তাঁহাকে উপরের ঘর ছাড়িয়া দিতে পারে, সে জন্য কিছু নয়—তবে কিনা খোকার জন্য একটা ঘরতো উপরে চাই। আর চন্দনের ভাবী সাবীদের দেখা সাক্ষাতের জন্য একটা বড় ঘর ছাড়িয়া রাখা প্রয়োজন, তা ভিন্ন সে বড় লোকের মেয়ে তাহার কষ্ট

করা—অভ্যাস নাই,—তাহার শয়নগৃহ উপবেশন গৃহ পোষাক পরিবার ঘর স্নানাগার ভোজনাগার—এইতো মোট সাতটি ঘরের দরকার,—তাই একটু মুস্কিল, এরূপ না করিলে চালতো বজায় থাকে না, লোকের কাছে মাথা কাটাও যায়,—অথচ ....”

উথলিত অভিমান রুদ্ধ করিয়া বিধবা অশ্রুমথিত স্বরে কহিলেন—“থাক্, কাজ নেই তোমাদের কষ্ট হবে, আমি এখানেই কোন মতে থাক্‌বো।” মনের মধ্যে একটুখানি লজ্জা বোধ করিলেও রঘু তাঁহাকে একটুও সান্ত্বনা দিতে পারিল না।

ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বদিন বৈকালে চন্দন স্বামীর সহিত নদী তীরে একটু বেড়াইতে গেল। এসব বিষয়েও সে লোক-গঞ্জনা গ্রাহ্য করিত না। বরং লোক দেখাইয়াই নিজের স্বাধীন প্রকৃতি প্রদর্শন করিতেই চাহিত। বলিয়াছি তখন বর্ষাকাল; পূর্ব্বের মতন এবারও বাঘমতির জল কূলে কূলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে,—ঠিক তেমনই করিয়াই দুই ধারের শস্যক্ষেত্র সকল ভাসাইয়া দিয়াছে। সেই সীমাতিক্রান্ত অ-থই জল দেখিতে দেখিতেই যেন তর তর করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল—বাঘমতীতে বন্যা আসিয়াছে। মাঠ জনশূন্য প্রায়, গাছগুলা বৃষ্টিধৌত হইয়া গাঢ় সবুজ হইয়া উঠিয়াছিল, জলের মধ্যে কোথাও সরবনের মধ্যে সাদা ফুল জলের উপর জল তরঙ্গের মতই বাতাসে ঢেউ তুলিয়া কাঁপিতেছে। পাহাড় ভাঙ্গা ধস ভাঙ্গা অকুল জলরাশি গৈরিকরাগে রাঙ্গিয়া যেন রক্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। রঘুনাথ চন্দনের হাত ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একটা পুষ্পিত মহুয়া গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল, ফুলে ফুলে গাছটার সবুজ পাতাগুলা প্রায় দেখা যাইতে ছিল না এবং মহুয়ার তীব্র গন্ধে মৌমাছির দল আকুল হইয়া বহু দূর হইতে ছুটিয়া আসিতেছিল। চন্দন মুগ্ধনেত্রে দেখিতে দেখিতে বলিল—“বাঃ, নদীটী বড় সুন্দর তো! এদেশেও এমন জায়গা আছে!” রঘু হাসিয়া

কহিল—"তা আছে বৈ কি, কোথাও কেবল বন থাকতে পারে না। এই আমার ছোট বেলায় খেলবার জায়গা"—বলিতে বলিতে তাহার স্মৃতি মন্দিরের রুদ্ধ কপাট যেন সহসা খুলিয়া গেল। সহসা এই কয় দিনের পর আর একজনের কথা স্মৃতিপটে যেন কোন সুদূর বিস্মৃতির তল হইতে জাগরুক হইয়া উঠিল। কই সেই অনাদৃতাকে তো সে এবার আসিয়া অবধিদেখিতে পায়নাই?

বিদায়ের সময়ে রোরুদ্যমানা জননীর পার্শ্বে রঘু একখানি পুরাতন পরিচিত মুখ দেখিল। খুকীকে কোলে লইয়া—ও কে? মতিয়া নয়? মতিয়াই ত! না না সে কি ঐ? সেই শুভ্র সুন্দর কচি মুখখানি, স্বর্গের জ্যোতিঃতে বিমণ্ডিত সরল স্মিত দৃষ্টি—সে কি অমন ম্লান কালিমাখা হইয়া যাইতে পারে? ওকি ভীষণ অবসাদ অবসন্ন মুমূর্ষু দৃষ্টি! এমন সময় হঠাৎ কে বলিল, "ওকি! তুই আবার মরতে মরতে কেন উঠে এলি মতিয়া? এদিকে দুদণ্ড বসবার শক্তি নাই ছেলে কোলে করেছিস্!"

একটু অপ্রতিভ হইয়া মতিয়ার চক্ষের দিকে না চাহিয়া রঘু বলিল,—"কেমন আছ মতিয়া?"—বলিয়াই সে সভয়ে চন্দনের দিকে চাহিয়া দেখিল। মতিয়া এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না, তাহার ম্লান ওষ্ঠ প্রান্তে শুধু একটু ক্ষীণ হাসি মাত্র দেখা দিল—সে বারেক তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই তাড়াতাড়ি নিজের সেই ক্লান্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

চন্দন গম্ভীরমুখে হতভম্ব স্বামীর পাশে আসিয়া তাঁহাকে চেতাইয়া দিয়া কহিয়া উঠিল—"কি গো, ট্রেণ ফেল করবে না কি?"—

"না না, এই যে যাই!"

এমন সময় মা বলিলেন, "খুকিকে দে'রে মতিয়া, আহা ওর এখনও সেই রঘু অন্ত প্রাণ! মা বাবা মরে গেল, বিয়েও হলো না, রোগ রোগ

ক'রে বিয়ে ক'রতেই কি চায়! এখন তো এই মরতেই বসেচে,—মুখে 'একটু জল দেয় যে এমন কেউ নেই। আজ থেকে তুই আমার ঘরে চলে আয়রে মতিয়া, এখন থেকে আমি 'তোর মা—তোকে আমিই দেখবো।"

হার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বালকটি গাড়ি চাপা না পড়িলেও ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। নিরজা অনেক কষ্টে তাহাকে তুলিয়া দু এক পা অগ্রসর হইতেই গাড়ির আরোহী নিকটে আসিয়া নম্রস্বরে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন— "ছেলেটিকে আমায় দিন, আপনি পার্ব্বেন না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,— তিনি বড় রক্ষাই ক'রেছেন!"

সত্যসত্যই সে পারিতেছিল না। তাই আগন্তুক চাহিবা মাত্রই সে বালককে বিনা-বাক্যে তাঁহাকে লইতে দিল।

তিনি বলিলেন—"একটু কষ্ট করতে হবে যে,—এদের বাড়ী যদি আপনি চেনেন—তাহলে অনুগ্রহ ক'রে আমায় সেটা—"

"আসুন"—বলিয়া নিরজা অগ্রসর হইল। তিনি তাহার অনুসরণ করিয়া কিছু দূরে একটি সামান্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। নিরজা বালকের মাতাকে চিনিত। সে তাঁহাকে একান্ত ভয়বিহ্বলা দেখিয়া সান্ত্বনার সহিত কহিল—"ভয় নেই, ননী পড়ে গিয়াছে। দোষ সব আমারই ও আমায় দেখে আহ্লাদ ক'রে ছুটে আসছিল,—আমি তা মোটে দেখিনি—"

অপরিচিত আগন্তুক সেই সময় সহসা বলিয়া উঠিলেন—"না না আমারই সমস্ত দোষ! আমি হয়ত অন্যমনস্ক হ'য়েই গাড়ি চালাচ্ছিলেম—তাইতেই এই বিপদ ঘটে গেছে। যাহোক ছেলেটি যে রক্ষা পেয়েছে এই আমার মহা ভাগ্য! এখন একে কোথায় শোয়াব দেখিয়ে দিনতো মা!"

বালকের মাতা বালকের জন্য বিছানা পাতিয়া দিলে তিনি তাহাকে সাবধানে তাহাতে শয়ন করাইয়া দিলেন। সকলে মিলিয়া সযত্নে সুশ্রুষা করাতে শীঘ্রই বালকের চৈতন্য হইল।

বালক তখন "মা" বলিয়া কাঁদিয়া দুই হাত মায়ের দিকে বাড়াইয়া দিল। মাতা সাগ্রহে ছেলেকে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন।

আগন্তুক বলিলেন—"আর কিছু ভয় নেই, ওকে এইবার একটু দুধ দিন—ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে"—স্বর নামাইয়া নিরজাকে বলিলেন—"ভয় এখনও সম্পূর্ণ যায় নাই, ডাক্তারকে একবার ডাকা উচিৎ। ওকি ওকি—"

নিরজা লজ্জার সহিত কাপড় টানিয়া শোনিতাক্ত স্থানটা চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া উত্তর করিল—"ও কিছু না।"

"কিছুনা, বলেন কি? রক্তে যে ভেসে গ্যাছে! আমি এক্ষণি ডাক্তার ডাকি—" অপরিচিত যুবাটি ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ইহা দেখিয়া নিরজা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"না না না,—এখানে মিথ্যে এঁদের ব্যস্ত ক'রে কি হবে? আমি বাড়ী যাই, বাবাকে দেখতে এক্ষুনিতো ডাক্তার আসবেন, তিনি এলে আমিই বরং তাঁকে এখানেও একবার পাঠিয়ে দোবো।"

"তা যখন বল্‌চেন;—কিন্তু তাঁকে কাটাটা একবার নিশ্চয়ই দেখাবেন। কি করে কেটে গ্যালো? গাড়ির চাকাটা বোধ হয় হাতের উপর পড়েছিল? ছিঃ, আমার এমন মনে হ'চ্চে!"

"আপনি দেখছি আমার জন্য বড্ডই ব্যস্ত হ'চ্ছেন! ও তেমন কিছুই তো কাটেনি। এতক্ষণ তো আমি জান্‌তেও পারিনি। আচ্ছা আমি তা'হলে এখন বাড়ী যাই।"

"হেঁটে যাবেন নাকি?"

"হ্যাঁ হেঁটেই যাবো, আমাদের বাড়ী তো এখান থেকে বেশী দূরে নয়।"

"আপনাকে কিন্তু বড্ডই ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আপনি,—যদি আপনার আপত্য না থাকে—আমি তাহ'লে আমার গাড়িটাতে আপনাকে পৌছে দিতে পারি। আমি এই সঙ্গে সঙ্গে হেঁটেই যাচ্চি।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া অগত্যা নিরজা সম্মত হইল। অপরিচিতের মুখে চোখে এমন একটা গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য মাখা ছিল যে তাঁহাকে অবিশ্বাস বা অগ্রাহ্য করিতে তাহার মন সরিল না—বোধ করি কাহারই সরিত না।

গাড়ি বা ঘোড়ার বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। নিরজার পিতার উদ্যানের কাছ বরাবর গাড়িটা আসিতেই সে বলিয়া উঠিল—"এই আমাদের বাড়ী।"

এই কথায় চমকিয়া আগন্তুক তাহার সঙ্গিনীর দিকে চাহিলেন। আপনা আপনি মৃদুস্বরে বলিলেন—"ওঃ," তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি বুঝি রাজেন্দ্র বাবুর কন্যা?"

চিন্তিত-মুখ তুলিয়া সে উত্তর দিল—"হ্যাঁ—কিন্তু আমি যে জন্য গিয়াছিলাম তা আজ আর হোলো না।"

একথাটা সে কাহার উদ্দেশে না বলিলেও তাহার সঙ্গী লোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ধৃষ্টতা মাপ করবেন, যদি আমার দ্বারা কোন কাজ হয়—" "না তা হয় না। তাহোক,—তাতে এমন কিছু ক্ষতি নেই। যতীনবাবুকে বল্লেই তিনি করে দেবেন'খন।"

সঙ্গের ভদ্রলোকটি হঠাৎ এমন ভাবে চমকাইয়া উঠিলেন যে, নিরজা সে চমক দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব সামলাইয়া লইয়া অনাগ্রহভাবে তিনি প্রশ্ন করিলেন—"কোন যতীন্দ্র বাবুর কথা আপনি বলচেন? যতীন্দ্রনাথ ঘোষ? 'আনন্দ-কানন' যাঁর বাড়ী?"

"হাঁ তিনিই—কিন্তু 'আনন্দ-কানন' এখন আর 'তাঁর' বাড়ী নেই।"

আগন্তুক গম্ভীরমুখে ঔদাস্যের সহিত কহিলেন—"ওঃ! তাঁর এখন ভারি দুঃসময় যাচ্চে বুঝি? আপনি তাঁকে বোধ হচ্চে খুব জানেন। তাই বল্‌চি।"

নিশ্বাস ফেলিয়া নিরজা ক্ষুব্ধভাবে উত্তর করিল—"চিনি বই কি! খুব চিনি। হ্যাঁ, তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই নষ্ট হ'য়ে গ্যাছে। বাড়িটা শুদ্ধ সেদিন বিক্রী হ'য়ে গ্যাল।"

তাহার সঙ্গীর মুখে একটা ঔৎসুক্যের ভাব দৃষ্ট হইল। তিনি যেন সেই আগ্রহের বেগ রোধ করিতে না পারিয়া একটুখানি কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন—"তাঁর সম্পত্তির নতুন অধিকারী এখানে আছে না?"

বাধা দিয়া নিরজা ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিল—"আমায় মাপ করবেন আমি তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা জানিও না আর তা জান্‌তে ইচ্ছুকও নই। তাঁর কথায় আমার কি দরকার?"

অপরিচিত ভদ্র লোকটি অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তিনি কি কিছু দোষ ক'রেচেন?"

নিরজা একটু চিন্তিতভাবে কহিল—"দোষ! কই না,—তা কিছু না! কিন্তু তিনি শুন্‌তে পাই খুব বড়লোক। তাঁর সামান্য একজন লোকের সহানুভূতি কম থাকলেও তো কিছু ক্ষতি হবে না। যে ভাগ্যহীন আজ অদৃষ্টক্রমে সৌভাগ্যের উচ্চ চূড়া হ'তে নিম্নের মাটিতে প'ড়ে গ্যাছে—আমার মনে হয় সকলেরই সহানুভূতি আজ তাঁর 'পরেই থাকা উচিত। আহা আজ তিনি যে একেবারেই নিঃস্ব!"

নিরজার আয়তনেত্রে দুই ফোঁটা সহানুভূতির অশ্রু ফুটিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে উষাকালের শিশির বিন্দুর মতন তাহার বিশাল নেত্রে টল টল ছল ছল করিতে লাগিল।

তাহার সঙ্গী ঈষৎ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন—"তার নাই কি? এমন কোমল প্রাণের অজস্র সহানুভূতি যার প্রতি রয়েছে তার আর এ জগতে কিসের অভাব? সাত রাজার ধনের চেয়ে সে তো বেশী ধনী।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিরজার জ্ঞাতি ভ্রাতা অমরনাথের বিবাহ কলিকাতায় হইলেও দেশে আসিয়া সেই উপলক্ষ্যে সে একদিন ভারি ধুম করিয়া বৌভাতের প্রীতিভোজ দিল।

নববধূ যুঁথিকা যুঁথিকার মত সলজ্জ অম্লান মুখখানি লইয়া অপরিচিত দলের মধ্যে একখানি চেনা মুখ দেখিবার আশায় করুণ চোখে চাহিয়া ছিল। সে বছর কতক বেথুন স্কুলে পড়িলেও অমরের মত নব্য সম্প্রদায়ের যুবকের ঠিক উপযুক্তা হইয়া গঠিত হইতে পারে নাই। তাই অমরনাথ তাহার সংস্কার কার্য্যে প্রথমেই অতিশয় মনোযোগ দিয়া তাহাকে অধিকতর সঙ্কুচিত করিয়া তুলিয়াছেন।

বাড়িতে বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী ভিন্ন অপর কেহ নাই। নিঃসঙ্গতায় বেচারী একেবারে হাঁফাইয়া পড়িয়াছে। ভাগ্যে নিরু-ঠাকুরঝি এই দুঃসময়ে আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছেন, তাই সে একটু ভরসা পাইয়াছিল। সে-ই এই ব্রীড়ানম্রাননা নব বধূকে আদব কায়দা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া তাহাকে তাহার অক্ষমতার ঘোর লজ্জা হইতে মুক্ত করিতেছিল। আর একটা বিষয়ে সে নিরজার কাছে বিশেষরূপ উপকৃত হইতেছিল এই যে, নিরজাকে দেখিলে নিমন্ত্রিতগণ সকলে তাহার সহিত কথা কহিতেই

উৎসুক হইয়া তাহারই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে থাকে,—যুঁথিকাকে আর কেহ চাহিয়াও দেখে না, সেও ইহাতে অনেকখানি বর্ত্তাইয়া যায়। সে তাই আগ্রহের সহিত তাহাকে খুঁজিতেছিল।

এদিকে তাহার স্বামীও তাঁহার এক বন্ধুর অনুরোধে সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে ঈষৎ ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন—"কই হে তাঁকে যে এতক্ষণে একবার দেখাতেই পাল্লে না।"

অমর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গাম্ভীর্য্যের ভানে কহিল—"ভাল জিনিষ তো তোমার আমার মত পথে ঘাটে ছড়ান থাকে না ভাই। একটু ধৈর্য্য রাখ,—দেখবেই এখন।"

বন্ধু হাসিয়া বলিলেন—"ধৈর্য্য থাকে কই।"

"অধৈর্য্য হ'য়েও তো কোন ফল নাই। মিঃ দত্ত! ভুলে যেও না, আমার বিশ্বাস নিরজা যতীন ছাড়া যে কারুর দিকে চাইবে তেমন মেয়েই সে নয়। কাকা তার জেদ জানেন বলেই না যতীনকে তার এত বড় দুর্দ্দশা থেকে প্রাণপণে টেনে তুলতে চেষ্টা ক'চ্চেন।"

"ভুলিনি অমর! কিন্তু মেঘ সমুদ্রে জল ঢালে বলে কি খানা ডোবাকে একেবারেই বঞ্চিত করে? তাঁর প্রাণে কি বন্ধুত্বের ভালবাসাও একটু বাজে লোকের জন্য পড়ে নেই?"

অমর পরিহাসের ভাব সম্বরণ করিল।—"বড় দুঃখ হ'চ্ছে! তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারচি। আমার অনুরোধ আর তুমি তার সঙ্গে বেশী দেখা সাক্ষাৎ ক'রোনা। ক'রলে সুখী হবে না। দেখ ভাই, ধন মান বিদ্যা বুদ্ধি যশ যা কিছু মানুষের প্রার্থনীয় তা সব তুমি অপর্য্যাপ্তই পেয়েছ। শুধু শুধু সাধ ক'রে জীবনে একটা অভাব ডেকে এনে ফল কি? সুখের উপাদান যা পেয়েছ তাই ভোগ কর। নিরজার চেয়েও অনেক যোগ্য পাত্রী তোমার পক্ষে দুর্ল্লভ হবে না।"

মিঃ দত্ত হাসিয়া উঠিলেন—"তুমি যে মুখে মুখেই আস্ত একখানা নভেল বানিয়ে ফেল্লে হে! জেনো অমর, তোমাদের মত কবিরা একবার কারু সঙ্গে দেখা হ'লেই ভালবাসায় হয় তো ডুবে পড়তে পারে, কিন্তু ভাই আইনজীবীর প্রাণ ততটা সরস থাকে না। ভয় পেয়ে যেও না—আমি বেশ সহজ সজ্ঞানেই আছি। সে ভয়ানক রোগের কোন লক্ষণই তুমি আমাতে দেখতে পাবে না। খাবার সময় দেখো পাতে কিছুই নষ্ট হবে না—রাত্রে দেখো চাঁদের আলোর সঙ্গে কিছু মাত্র সম্পর্ক থাকবে না: আমার আবার বেজায় সর্দ্দির ধাত।"

অমর নিরজাকে তাহাদের অল্প দূরে দেখিয়া স-সব্যস্ত হইয়া পড়িল। "ওই যে সে,—তা হ'লে তোমার মত বদলায় নি? দেখা ক'র্ব্বে?"

"কেন ক'র্ব্বো না? আমি ওঁকে বন্ধু মনে ক'রে গর্ব্বিত হ'তে চাই, তুমি মিথ্যা বাধা দিও না। তোমার ভগ্নী একাই তোমার নয়—এ জেনো, আমাদেরও তাঁ'তে কিছু কিছু অংশ আছে।"

"বেশ, কিন্তু আবার মনে ক'রে দিচ্ছি, তার চেয়ে বেশী দাবী যেন ক'রে ফেলো না—তা হ'লে সব দিকই নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

মিঃ দত্ত মৃদু হাসিলেন,—"ভয়েই যে অস্থির হ'লে! আমায় কি তুমি এমনই আহাম্মক মনে কর নাকি? থাক, ও সব বাজে কথায় আর কাজ নেই। এসো ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে।"

তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। নিরজাও অমরনাথকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার দিকে ফিরিল। মৃদু হাসির সহিত বলিল—"অমর দাদা, জুঁই যে—" মিঃ দত্তকে দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল—"আপনি?"

"আমায় চিনতে পেরেছেন!" মিঃ দত্ত মৃদু হাসিলেন, "আপনার সেই কাটাটা?"

নিরজা মুখ নত করিয়া সলজ্জ হাসি হাসিয়া উত্তর করিল—"সে ভাল হ'য়ে গ্যাছে।"

"সেই ছেলেটিকে দেখতে গেছলেম, তার অল্প একটু জ্বর হ'য়েছিল, এখন সে বেশ সেরে গ্যাছে।"

"আপনি গেছলেন! আমি কিন্তু আর যেতে পারিনি। বাবা ও পিসিমা ভাবেন বুঝি রোজই তেমনি কিছু একটা না একটা বিপদ আমার জন্য রাস্তায় অপেক্ষা ক'রছে।" বলিয়া নিরজা মৃদু হাসিল।

"সত্য সত্যই আমার সেদিন বড় অন্যায় হ'য়েছিল। আপনি চিৎকার ক'রে না উঠলে আমি ছেলেটিকে তো শেষ পর্য্যন্ত দেখতেই পাইনি। কি ছোট্ট ছেলেটি, কেমন ক'রে আপনি আপনি রাস্তায় বের হ'য়ে প'ড়েছিল! উঃ যদি আমার দোষে সে মারা পড়তো!"

"তাতে আপনার দোষ বেশী ছিল না। তা আপনি দোষের চেয়ে প্রায়শ্চিত্ত অনেক বেশীই ক'রেছেন। বাস্তবিক আপনি ভারি দয়ালু!"

মিঃ দত্ত লজ্জিত হইয়া সে প্রসঙ্গ চাপা দিলেন।—"আপনার বাবা ভাল আছেন?"

"অনেকটা।—কেমন আমাদের বউ দেখ্‌লেন? অমরদাদা, ও অমরদাদা! যাঃ, চ'লে গেছেন!"

মিঃ দত্ত সস্মিতমুখে উত্তর দিলেন—"বউ তো আমার অচেনা নয়, জুঁই যে আমারই প্রতিবেশী।"

অমরনাথ সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল। নিরজা চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে দেখিল তিনি হলের অপর দিকে এক অপরিচিতা বালিকার সহিত কথা কহিতেছেন। সে বিস্ময়ের সহিত সেই শ্যামাঙ্গী সুশ্রী মেয়েটিকে দেখিতে দেখিতে মিষ্টার দত্তের কথার শেষে বলিল—"তবেতো আপনি তার আপনার লোক!" বলিয়া তাঁহার দিকে সকৌতুকে চাহিয়া হাসিল।

মিঃ দত্তও একটু হাসিলেন, পরে বলিলেন,—"আপনার সঙ্গে তার বোধ হয় খুব বন্ধুত্ব হ'য়েছে?"

"হাঁ খুব।—আচ্ছা ও মেয়েটি কে চেনেন? আমি তো ওকে এর আগে এখানে কখন দেখিনি!"

মিঃ দত্ত সহাস্যমুখে উত্তর করিলেন—"চেনা তো উচিৎ—ও আমারই ছোট বোন পুষ্প।"

"আপনার বোন! ওঃ আপনার নাম তো আমি এখনও জানতে পারিনি? অমরদাদাই বা কিরকম লোক, তিনিও তো কই কিছু বল্লেনওনা!"

লজ্জা পাইয়া নিরজা তাহার সুনীল নেত্রদ্বয় তুলিয়া মিঃ দত্তর দিকে চাহিল—"আমার এই ধৃষ্টতাটা মাপ ক'র্ব্বেন, আমার বড়ই জানতে ইচ্ছা হ'চ্ছে কার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হ'লো?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মিঃ দত্ত কিছু যেন শঙ্কিত ভাবে উত্তর করিলেন—"আমার নাম মোহিতকুমার দত্ত।"

নিরজার মুখ মুহূর্ত্তে ঈষৎ গম্ভীর হইয়া আসিল—"আপনি বোধ হয় 'মিষ্টার দত্ত' নন? কল্‌কাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার—

"হ্যাঁ আমিই ব্যারিষ্টার মোহিতকুমার দত্ত।"

"হরিপুর ষ্টেটের নূতন জমিদার?—" নিরজার স্বর হইতে বন্ধুত্বের কোমলতাটুকু চলিয়া গিয়াছিল।

মিঃ দত্ত তাহার সেই অহেতুক ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টির নীচে নিজের সতেজ নেত্রের প্রশান্ত দৃষ্টি নত করিলেন।—"দুর্ভাগ্যক্রমে আমি হরিপুরের নূতন জমিদার,—মিস্ রায়।"

নিরজা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"মিষ্টার দত্ত আমায় আপনি মাপ ক'র্ব্বেন, আমার একটুখানি কাজ আছে, আমি এখন একবার যাই।" সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

মিঃ দত্তের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। হরিপুরের নূতন জমীদার যে তাহার কাছে কি অপরাধে অপরাধী তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি আমার উপর রাগ ক'রলেন? আমি কি কিছু অন্যায় ক'রে ফেলেছি?"

উত্তেজিত-স্বরে নিরজা উত্তর দিল—"আমি কি আপনাকে ব'লেছি যে—'আপনি কিছু অন্যায় ক'রেচেন?' আমার কাজ আছে আমায় যেতে হবে, নমস্কার।"

বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে মিঃ দত্ত সেই ঘৃণাপূর্ণ রাগ রক্তিম মুখের পানে চাহিয়া দুঃখিত ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন—"নমস্কার! আশা করি এবার যখন দেখা হবে আপনাকে আমার কোন্ অজ্ঞাত অপরাধের জন্য দুঃখিত ক'রেছি তা জান্‌তে পেরে তার প্রায়শ্চিত্তও ক'রতে পার্ব্বো। অমর যামিনীর ভগ্নী আপনি,—আমি তাদের বন্ধু, আমিও সেই সম্বন্ধের দাবী করি।"

ঘোর বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে একবার মাত্র চাহিয়া বিনা-বাক্যে নিরজা অন্য দিকে চলিয়া গেল। তাহার এই অত্যদ্ভুত ব্যবহারে আহতচিত্তে মিঃ দত্ত ভাবিলেন—"আহা যদি আমি হরিপুর ষ্টেটের নতুন জমিদার না হইয়া পুরাতন জমিদার হইতাম!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"মিস্ রায়, তোমাদের কিসের ঝগড়া হ'চ্ছিল? ওঁর উপর অত রেগেছিলে কেন? উনি কি ব'লেছেন?"

"ঝগড়া কিসের যতি বাবু! আমি ও লোকটাকে মোটেই কেমন

পছন্দ করি না। ও একটুও ভাল লোক নয়। কেন, ও তোমার বিষয় কিনে নিলে কিসের জন্য !"

"তোমার মত মন সংসারে ক'জনার আছে ? সুবিধা পেলে কে কাকে ছাড়ে বলো ? আমার বাড়ীটা বড় অল্প দামে কিনে নিয়ে লোকটা আমায় বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত ক'রেছে। হ্যাঁ তবে সেদিন ব'লেছিল বটে যে, যদি আমি ওই দামে আবার কিনে নিতে পারি তো সে ফিরিয়ে দেয়। তাই বা আমি কোথা পাবো ? জানে আমার সে ক্ষমতা নাই, তাই ওটা আমায় তামাসা করা হ'লো বুঝলে না ?"

"বেশ তো আমি বাবাকে না হয় ব'লে দেখবো তিনি যদি টাকাটা দিয়ে কিনে নেন।"

"তোমার মত মন কি সবার মিস্ রায় ! আর তাইবা কি ব'লবো ? তিনি কতই দেবেন ? তোমারই কথায় চাকরী দিয়েছেন। আবার বাড়ীর জন্য অত টাকা দেবেন কেন ? তুমি এখনও আমায় এত যত্ন ক'রচো দেখে আমি বড় সুখী হলেম। বিপদের দিনের বন্ধুত্বই প্রকৃত বন্ধুত্ব।"

"যতীবাবু, অমন ক'রে ব'লো না। তুমি কি মনে করো তোমার জমীদারিটাই আমার বাল্য বন্ধু ছিল ? সেটার সঙ্গে তাই আজীবনের সকল সৌহার্দ্দ মুছে যাবে !"

"না আমি কি তোমার মন জানিনে ! এবার যদি কলে লাভ করাতে পারি, তাহলেই আমি আবার মাথা তুলতে পারবো। তা না হ'লে আমার সব আশাই ফুরিয়ে যাবে।"

সগর্ব্বে নিরজা বলিয়া উঠিল—"যতীবাবু আমি তো কতবার তোমায় ব'লেছি—ও সব অলীক ভাবনা তুমি ছেড়ে দাও। যতক্ষণ আমার এদেহে প্রাণ আছে, আর তোমার মধ্যে সেই সরল সত্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততক্ষণ আমি এ প্রাণ উৎসর্গ ক'রেও আমার

বাল্য সুহৃদকে রক্ষার চেষ্টা ক'রবো। লোকে বলে তুমিই—উচ্ছৃঙ্খলতায় বিষয় নষ্ট ক'রছ,—কিন্তু আমি কি একথা মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাস ক'রছি? আমি জানি পৈতৃক দেনায় তুমি সর্ব্বস্বান্ত। তাই আমার এত কষ্ট তোমার জন্য হয়। নিজে পাপী না হ'য়েও তুমি অন্যের পাপের এই দারুন প্রায়শ্চিত্ত ক'রচো, এ যে বড় ভয়ানক!"

ম্লানমুখে যতীন্দ্রনাথ বলিলেন—"আমার আর কিছুই ভরসা হয় না মিস্ রায়! মিষ্টার দত্ত এসে পর্য্যন্ত আমার বড় ভয় হ'য়েছে। কি জানি আমার মনে হয় সে আমার মহা শত্রু!" সে গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

বাধা দিয়া সভ্রুভঙ্গে নিরজা গর্ব্বিতস্বরে কহিল—"ওঃ ওঁকে তোমার কিসের ভয়? ওঁর কথা নিয়ে আমি মনকে উত্ত্যক্ত ক'রতে চাইনে। এসো বারান্দায় বসিগে, ভারি গরম। বাবাও বোধ হয় বাহিরেই আছেন। তাঁর কাছে যাই এসো।"

অদূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের গতিবিধি ঈর্ষায় চক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে মিঃ দত্ত অমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যতিন ঘোষ বুঝি তোমার কাকার ম্যানেজার হ'য়েচে?

অমর উত্তর দিল—"হাঁ, আর কলের অংশীদারও।"

"আর ভাবি জামাই না?"

"খুবই সম্ভব, সেইটেই তো হ'ল প্রধান কথা। সেই জন্যই তো বিনা পয়সায় অংশীদার ক'রে নিয়ে ওর উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'র্চ্চেন। তবে এখনও সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথাবার্ত্তা হয় নি। দু একটি খুব সৎপাত্র নিরুর হস্ত প্রার্থনা ক'রেছিল, তাতে নিরু তাদের মহা অগ্রাহ্য ক'রে ত্যাগ করে,—বলে সে বিয়ে ক'রবে না। তাতেই আমরা এইটে আন্দাজ ক'রেচি আর কি। সে এপর্য্যন্ত কিছুই বলে নি অবশ্য।"

"কিন্তু ম্যানেজারির পক্ষে কি লোকটি খুবই উপযুক্ত?"

অমরনাথ হাসিল।—"যাকে তিনি কন্যাদান ক'র্‌তে পারেন তাকে ম্যানেজারির জন্য বিশ্বাস ক'রতে পারেন না?"

মিঃ দত্ত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"আমি ওকে যতদূর জানি ওকে জমিদারি চালাবার মত ক্ষমতাপন্ন ব'লে তো কোন মতেই মনে করতে পারি না। তা হলে নিজের সমস্ত বিষয় কি নষ্ট হয়? অবশ্য ওঁরা বেশী জানেন।"—

"ওর সব তো মোকদ্দমায় নষ্ট ক'রেচে। হাঁ, যা ব'ল্‌চো তা সত্যি বটে! কাকারও আজ কাল চারদিকে এত মোকদ্দমা বাধাচ্চে শুনছি। কিন্তু কাকা ওকে খুব ভালবাসেন আর বিশ্বাসও করেন। ও বেচারির এখন বড় কষ্টের সময়। পৈতৃক সম্পত্তি আর কিছুই নেই, এখন ওই যা ওঁদের দু'জনকার দয়াটুকুই ভরসা।"

মিঃ দত্ত তীক্ষ্ণ স্বরে উপহাসের ভাবে বলিলেন—"কেন অমন সুন্দর চেহারা আছে আর কি চাই? ওর জোরেই তো ও সমস্ত দুঃখের সমুদ্র পার হ'য়ে যেতে পারবে।"

অমরনাথ বুঝিল লক্ষপতির অভাববোধটা কোথায় পৌঁছিয়াছে। মনে মনে একটু দুঃখিত হইল। প্রকাশ্যে হাসিয়া ব্যঙ্গ করিল, বলিল—"যার যা নাই তাই নিয়ে সে অন্যের হিংসা করে। ওর জমিদারী বাড়ি বাগান সব নিয়েও বুঝি তোমার মন উঠলো না? আবার ওর রূপ-টুকুর ওপোর দৃষ্টি দিচ্ছ! না ভাই, ওটুকু ওর থাকতে দাও, ওইটুকুর জোরেই ও নিঃস্ব হ'য়েও ধনী।"

মিঃ দত্ত হাসিলেন—"ওইটুকুর বদলে আমি ওর জমীদারি মায় বাগান বাড়ি সব ওকে ফিরিয়ে দিতে পারি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নিরজা বড় রাগিয়া গেল। হরিপুরের নূতন জমিদার কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধানতম ব্যারিষ্টার পূজার বন্ধের তিন মাস তাহাদের বাড়ির অল্পদূরে যতীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাড়িতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সে বাড়ীও এখন জীর্ণ শরীর গোলাপি রংয়ে ঢাকিয়া ভিতর বাহিরে নূতন সাজ পরিয়া যেন সম্পূর্ণ নূতন হইয়া গিয়াছে। নিরজা ছাদে উঠিয়া আর সে বৃষ্টির জলে জলে মলিন; স্থানে স্থানে চুণ সুরকী খসিয়া পড়া চিলের ছাদ দেখিতে পায় না। জানালা হইতে আর সে পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটের ভাঙ্গা সিঁড়িগুলা দেখা যায় না। যেখানে বসিয়া যতীন্দ্র নাথ সকালে বিকালে ছিপ লইয়া মাছ ধরিতেন, বেহালা এস্রাজ লইয়া সুশিক্ষিত মধুর কণ্ঠে গান গাহিতেন, এখন সেখানে নূতন অধিকারী গাছের কেয়ারির মধ্যে মর্ম্মর সোপানের দুই পার্শ্বে লৌহ বেঞ্চ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি নিজে সেখানে সন্ধ্যা সকালে মোটা মোটা বই কোলে লইয়া বসিয়া থাকেন। স্তব্ধ রাত্রে নিরজার মুক্ত বাতায়ন পথে বাতাস আর সে চিরপরিচিত কণ্ঠের সুমিষ্ট সঙ্গীত সুধাধারা বহিয়া আনিয়া আর তাহাকে পুলকে কণ্টকিত করে না। সে কি গান! সে কি সুর! সে গানের সুরে যেন রাগরাগিণী মূর্ত্ত, দীপ্ত হইয়া উঠে! তাহার বিভিন্ন ছন্দে যেন আগুন জ্বলে, মলয় বহে, নদীর তরঙ্গ ফিরিয়া দাঁড়ায়! রক্তের মধ্যে অগ্নি শিখা জ্বলিয়া উঠে! নূতন আগন্তুক কোথা হইতে আসিয়া তাহার চোখের উপর হইতে তাহার সমস্ত আনন্দের আগ্রহের স্মৃতিগুলি মুছিয়া দিয়াছেন। কোন

খানেই যেন সেই সব পূর্ব্ব চিহ্নের বিন্দুমাত্রও ফেলিয়া রাখেন নাই। দরিদ্র ব্যক্তি হঠাৎ ধনবান হইলে সে যেমন তাহার পুর্ব্ব দারিদ্রের এতটুকু কোন চিহ্ন সহ্য করিতে পারে না, যতীন্দ্র নাথের বাগান বাড়ীও নূতন বড়লোকের হাতে পড়িয়া তাহার গত দুর্ভাগ্যের কোন চিহ্ন কোথাও রাখিয়া দেয় নাই।

সে সব দৌরাত্ম্যও বরং সহ্য করা যাইতে পারে; কিন্তু সে যে আবার যখন তখন তাহার পিতাকে বৈষয়িক পরামর্শ দিতে আসে, এ যে একেবারেই অসহ্য! এতে যেন অহঙ্কার করিয়া স্পষ্ট জানান হয়—'দেখো আমি কেমন ভাল লোক! অপদার্থ যতেটা তোমার ম্যানেজার, আমি তার ভুল ধ'রে দিয়ে তার হাত থেকে তোমায় রক্ষা ক'রচি, না হ'লে তার মত তুমিও এতদিন ধ্বংশ হ'য়ে যেতে।'

এক দিন অত্যন্ত বিরক্তির মুখে আত্মদমন করিতে না পারিয়া সে বলিয়া ফেলিল—"বাবা তুমি নাকি কল বিক্রী ক'চ্চো? দত্তর পরামর্শ নিয়ে নাকি খনির ও—"

বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ মা তাই ত মনে কচ্চি। মিঃ দত্ত একজন খুব সৎবিবেচক বুদ্ধিমান লোক। উনি যখন ব'লচেন—মৈত্ররা যখন লাভ দিয়ে কল কিনতে চাইচেন, তখন এই বেলা বিক্রী ক'রে দিন। ওঁরাই এত দিন চালাচ্ছিলেন ওঁরা নেন তো সে ভাল হবে, আমাদের হাতে ভাল তো চ'ল্‌চে না, ক্রমাগত লোকসানই হ'তে থাকে। তাঁর মতে এবছরও ময়দার কলে, তেলের কলে লাভ হবে না। তার চেয়ে একটা কাপড়ের কল ঐ টাকায় আরও কিছু দিয়ে যদি ক'রতে পারা যায় তাতে অনেক লাভ হয়, দেশের উপকারও হয়। তিনি নিজে কাপড়ের কলের জন্য খুব চেষ্টা ক'রচেন। আমাদের দু'জনেই বেশী টাকাটা দেব, উনিই ম্যানেজিং ডিরেক্টারদের মধ্যে থাকবেন।"

"হ্যাঁ তাঁর যেমন কথা! তাঁর কথা শুনে তুমি কাপড়ের কল খুলে মিথ্যে টাকা নষ্ট ক'রো না, বাবা! উনি তো এ সবের সবই বোঝেন! যতি বাবু ব'লছিলেন,—কল যদি লোকসানের হ'তো, তা'হলে মৈত্ররা টাকা পেয়েই আবার ফিরিয়ে নিতে চাইত না। খনির জন্য নাকি একজন অন্য লোক রাখা হবে শুনচি!"

"উনি তো তাই বলেন। ব'লছিলেন,—একজন লোক সব দিক দেখা শোনা ক'রে উঠতে পারেন না তাই ভাল লাভ টাভ হয় না। তা ছাড়া যতীন তেমন পাকা লোকও তো নয়।"—"

নিরজা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল—"না যত পাকা উনি নিজেই! এমন হিংস্থকে লোক তো আর ভূ-ভারতে দুটি নেই! লোকটার সব বিষয়েই যেন কতই অভিজ্ঞতার ভান, কিন্তু আসলে কি তাতো কিছুই দেখতে পাই নে! যতিবাবু ব'লছিলেন,—এমন করে ওঁকে জ্বালাতন ক'রলে তো উনি আর টেঁকতে পারেন না। উনি এসে যখন তখন ওঁর ছুতো ধর্ব্বেন, সব মকদ্দমাই ওঁর কথায় তুমি তুলে নিতে হুকুম দেবে, ওঁকে এতে আর কেউ মানেও না, গ্রাহ্যও করে না। ওঁকে কত ব'লে ক'য়ে তবে আমাদের এই চাকরি নিতে দাদা মত করিয়েছেন, তাতো জানো বাবা? উনি বলেন দস্তুর ব্যবহারে উনি বড়ই অপমানিত হ'চ্চেন! ওর তাঁবেদার হ'য়ে থাকতে উনি পার্ব্বেন না।"

বলিয়া নিরজা আরক্তমুখে মুখ ফিরাইল—"তবে উনি না হয় কাজ ছেড়েই দিন, অন্য লোকই না হয় ভাল দেখে খোঁজা হোক।"

কন্যাকে ব্যথিত দেখিয়া কন্যাস্নেহাতুর পিতা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন! ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"না মা তাঁকে তোমরা বুঝিয়ে বলো, তিনি যা ভাল বোঝেন, তাই করুন। তা মোহিতের তো দোষ নয়। তাঁকে আমিই তো পরামর্শ চাই,—নাহ'লে তাঁর আমাদের সংসারের কথায় কি

দরকার? তিনি বলেন ;—মকদ্দমা মামলা ক'রে প্রজাদের মিথ্যে মিথ্যে চটিয়ে তোলা হয়। এ সব সাজান মামলা— শেষ অবধি টেকেও নাতো।—"

ক্রোধে নিরজা পাংশু হইয়া উঠিল।—"এত বড় মিথ্যা অপবাদ! বাবা, দেশে এত লোক থাকতে—"

"আচ্ছা মা আমি তাঁর পরামর্শ আর না হয় বেশি নেবো না।" বৃদ্ধ জমীদার একটু ভাবিয়া বলিলেন—"কিন্তু লোকটা খুব বুদ্ধিমান ব'লেই আমি তাঁর পরামর্শ চাইতাম। যতীনের চেয়ে তিনি বোধ হয় বেশি বোঝেন। হাজার হোক একটা বড় ব্যারিষ্টারও তো।"

কন্যা অভিমান করিয়া কহিল—"বাবা কি বলো! এঁরা পুরুষানুক্রমে জমীদারি চালাচ্ছেন,—আজই না হয় ওঁর এই অবস্থা হ'য়ে পড়েছে, আর দত্তর বাপ শুনেছি রেলওয়ে আফিসে সামান্য একটা কেরাণী ছিল। যতিবাবুর সঙ্গে ওঁর তুলনা হতেই পারে না। ব্যারিষ্টার আছে সত্যকে মিথ্যা দিনকে রাত ক'রতে পারতে পারে, তাতে চালাকি থাকতে পারে, সংবুদ্ধির বিষয় এতে কি আছে, কি বুঝব?"

বৃদ্ধ অতি স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া কন্যার মন্তব্যের বিরুদ্ধে সহজ সত্যটুকু পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। এই কন্যাটির উপর তাঁহার অপর্য্যাপ্ত বিশ্বাস ছিল। সঙ্গত ও অসঙ্গত সকল বিষয়েই তিনি কন্যার কাছে পরাজয় মানিয়া লইতেন। তা বিষয় যত গুরুতরই হউক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যামিনী এ বিপদে একেবারে চারিদিক অন্ধকার দেখিল। সেও পিতার মত নিরজার উপর বড় নির্ভর করিত। তাই টেলিগ্রাম পড়িয়াই ছুটিয়া নিরজার ঘরেই গেল। খোলা জানালার কাছে একটা আরাম কেদারায় শয়ন করিয়া আর্দ্র চুল ছড়াইয়া দিয়া সে একটা বই পড়িতেছিল। জানালার মধ্য দিয়া রৌদ্র আসিতেছিল, ঈষৎ শীতোষ্ণ বাতাসে ঘরের সমস্ত পর্দ্দাগুলা ও টানাপাখার ঝালর নড়িতেছিল। নিরজার চক্ষের সম্মুখে ইংরাজি উপন্যাসের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নায়িকা তখন স্বীয় নির্ব্বাচিত পতিগ্রহণ করিতে না পাইয়া পিতার প্রতি অভিমান করিয়া আত্মঘাতিনী হইতেছিলেন। অবশ্য তৎপূর্ব্বে একখানা 'শার্দ্দূল বিক্রিড়িত' ছন্দে খুব বড় করিয়া একখানা পত্রও লিখিয়া রাখিয়া যাইতে ভুল করেন নাই। সহানুভূতিতে নিরজার চোখ ছল ছল করিতে ছিল। হতভাগ্য নায়কের জন্য তাহার কণ্ঠ হইতে দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল। ঠিক এমনি সময়টিতেই ভ্রাতাকে হঠাৎ শুষ্কমুখে দ্রুতপদে আসিতে দেখিয়া তাহার কাল্পনিক সহচরদের কথা বিস্মৃত হইয়া সে ধড় মড়িয়া বই ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল।

যামিনী ঘরে ঢুকিয়াই উচ্চকণ্ঠে—কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল—"নিরো, নিরো, আমাদের সর্ব্বনাশ হ'লোরে, আমাদের সর্ব্বস্ব গ্যাছে!"

চমকিয়া নিরজা ভয়ত্রস্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"সেকি! কেন দাদা, কি হ'য়েছে?"

"আজ কিস্তির শেষ দিন। দুর্ভিক্ষের জন্য বেশী খাজনা এবারতো আদায় হয়নি। যাও বা সামান্য আদায় হ'য়েছিল আর ম্যানেজার

কলের টাকা থেকে খাজনা দেবার জন্য যা টাকা অনিয়েছিলেন, সে সব প্রজারা দাঙ্গা ক'রে নাকি লুটে নিয়ে গ্যাছে। তিনি আমাদের পূর্ব্বে কিছু জানান নি। অন্যত্রে টাকা ধার করবার চেষ্টা কচ্ছিলেন, কিন্তু তাও পেরে ওঠেন নি। আজ এক মাসও শেষ হ'য়ে গ্যালো, আজ এক্ষুনি টেলিগ্রাম ক'রেছেন। আবার শুনছি কলেও নাকি বিস্তর লোকসান হ'য়ে গ্যাছে!"

বাহির হইতে একজন ভৃত্য ডাকিয়া বলিল—"বাবু দোসরা আউর এক তার আয়া।" ভ্রাতাভগ্নী একই রূপে স্পন্দিতবক্ষে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। যামিনী কম্পিতহস্তে খামটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া খানিকটা পড়িয়াই বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার হস্ত হইতে কাগজটা পড়িয়া গেল।

নিরজা তাহার লেখার উপর চোখ বুলাইয়া গিয়া বজ্রাহতের মতই স্তম্ভিত হইয়া রহিল। হতাশকণ্ঠে যামিনীনাথ বলিলেন—"আমাদের যেখানে যা ছিল সব গেল, আর কিছুই আশা ভরসা আমাদের নেই। কয়লার খনিতে আগুন ধ'রে ভয়ানক বিপদ হ'য়ে গ্যাছে। জন কতক কুলি পর্য্যন্ত মারা পড়েছে!"

নিরজা ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—"কি হবে, দাদা?"

একটু সামলাইয়া লইয়া যামিনী উঠিয়া নিরজার কাছে আসিলেন। "তুই অত অধীর হ'স্‌নে নিরু! কি উপায় আছে ভাল ক'রে একবার ভেবে গ্যাখ! জমিদারীর মালগুজারি আজ না দিলেই নয়। কলেক্টরীর খাজনা আজ দাখিল না ক'র্ত্তে পারলে কাল আমাদের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। হতভাগা ম্যানেজারই এই সর্ব্বনাশটা ক'ল্লে।" ক্রোধে অনুশোচনায় যামিনীনাথ রুদ্ধ কণ্ঠে থামিয়া গেলেন।

ধীরে ধীরে নিরজা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং অল্প পরে আসিয়া মুহ্যমান ভ্রাতার হস্তে একটা ফিতাবাঁধা ক্ষুদ্র বাণ্ডিল দিয়া বলিল —"আমার নিজের জমানো এই পাঁচশো টাকা আছে দাদা, আর আমার ও আমাদের মায়ের গহনা এই বাক্সে আছে' এর দামও অন্ততঃ দশ হাজার টাকার কম হবে না।"—বলিয়া সে একটা ছোট বাক্স খাটের উপর রাখিল।

মাথা নাড়িয়া যামিনী হতাশভাবে কহিলেন—"এক্ষুনি আমি গহনা কোথা বেচতে যাব? সময় থাকলে আর ভাবনা কি ছিল। এত নগদ টাকা এখন কে দিতে পারবে?—"

নিরজার বিবর্ণ মুখ সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। "দাদা একজন বোধ হয় শুধু আমাদের রক্ষা ক'র্ত্তে পারেন। কিন্তু তাঁকে আমি না বুঝে বড় অপমান ক'রেছি, তিনি কি তা ভুলতে পার্ব্বেন? তাঁর পরামর্শ যদি তখন বাবাকে নিতে দিতেম তা হ'লে বোধ হয় এমন বিপদ আমাদের ঘ'টতো না—"

যামিনী উৎসাহের সহিত বলিল—"কার কথা ব'লচো, মিষ্টার দত্তর? আচ্ছা দেখি তিনি এখানে আছেন কি না। আজ তাঁর কল্‌কাতা ফিরে যাবার কথা ছিল যে।"

"দাদা, বাবা কি ক'রচেন?"

"তিনি একেবারে হতাশ হ'য়ে ভেঙ্গে প'ড়েছেন, তবু এখনও খনির কথাটা তো শোনেন নি। তাঁরই জন্য বেশী ভয় নিরু! আমাদের জন্য আমি ততো ভাবি না। এ বয়সে যদি অবস্থার এমন বিপর্য্যয় ঘটে তা হ'লে তিনি কক্ষন বাঁচবেন না।"

* * * * *

"মিষ্টার দত্ত, আমায় আপনি ক্ষমা ক'রবেন। আমি আপনার কাছে অত্যন্ত অপরাধী।"—

মিঃ দত্ত লজ্জিতার শঙ্কিত বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু স্নেহের হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন—"ক্ষমা কিসের মিস্ রায়। আপনি তার জন্য কিছু দুঃখিত হবেন না। আপনার বাবা আমায় ডেকেচেন। আমি পাঁচটার ট্রেনে কল্‌কাতা যাব; বেশী সময় তো নেই, তিনি কেন ডাকচেন শুনে আসি।"

শুনিয়া নিরজার মাথা ঘুরিয়া গেল। সে লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে গিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আমাদের এ বিপদে আপনিই একমাত্র ভরসা, দয়া ক'রে আমাদের রক্ষা করুন। না হ'লে আমার বাবা আর বাঁচবেন না।"

মোহিতকুমার সাশ্চর্য্যে নিরজার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন, পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হ'য়েচে?"

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে নিরজা সকল কথা বলিল, শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"আমারই সব দোষ, আমিই আপনার কথামত চ'লতে বাবাকে বারণ করি—"

স্থিরভাবে সকল কথা শুনিয়া হাঁফ ছাড়িয়া মোহিতকুমার কহিলেন—"আচ্ছা আমি তাঁর কাছে যাচ্চি।"

তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন, ও কিছুক্ষণ পরেই নামিয়া কোন দিকে একবার না চাহিয়াই সোজা চলিয়া গেলেন। নিরজা নিজের ঘরে জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। যতীন্দ্রের উপর খুব রাগ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই রাগ আসিল না। বরং তাঁহার লজ্জা মনে করিয়া তাহার প্রতি মনের মধ্যে অনেকখানি সহানুভূতি আসিল। সে কি করিবে, তাহার দোষ কি? ভালর জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া কপাল দোষে মন্দ হইয়া গেল বৈতো না! আহা গরীব বেচারা!

যামিনী তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল—"তোকে বাবা ডাকছেন।"—পরে কাছে আসিয়া তাহার কাঁধের উপর সস্নেহে হাত রাখিয়া কোমলস্বরে বলিল—"নিরু, লক্ষ্মীটি বোন, বাবাকে বাঁচাতে চেষ্টা করিস্। তাতে যদি নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে'হয় তো সে দিকে চোখ দিস্‌নে! তোর ক্ষতি জীবনে হয়তো পুরতে পারবে, কিন্তু বাবার প্রাণ দুবার পাবি নে, এই কথাটা মনে রাখিস্ বোন। না তুই, আমায় কেন জিজ্ঞাসা ক'রছিস্,—আমি কিছু জানিনে, তুই যা।"—

বিস্মিতা নিরজা পিতার ঘরে গিয়া তাহার অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। তাঁহার রুগ্ন দেহ যেন এ প্রবল আঘাতে একেবারে ঝড়ে ভাঙ্গা গাছের মত বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। মুখে চোখে হতাশার স্পষ্ট রেখা আঁকা। কন্যাকে দেখিয়া তিনি কষ্টে উঠিয়া বসিলেন। তাহার দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া কম্পিত ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"নিরু মা, আজ শুধু তুমিই আমায় রক্ষা ক'র্ত্তে পার।"

নিরজা আশ্চর্য্য হইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বোলচো বাবা?" সে ভয় করিতেছিল পাছে পিতা এই আঘাতে উন্মাদ হইয়া গিয়া থাকেন।

রাজেন্দ্রনাথ কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"নিরু, আমাদের যে বিপদ সে তুমি ভালই বুঝতে পারচো, তোমায় আমি আর কি বোঝাব? আমার খনি গ্যাছে, কল যায়, জমীদারী নিলামে চ'ড়তে আর বেশী দেরী নাই। কাল তোমাদের দু'জনকার হাত ধ'রে আমায় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কলের জন্য বিস্তর দেনাও আমার হ'য়ে গ্যাছে। এই মুহূর্ত্তে টাকা দিয়ে এক মিষ্টার দত্তই আমায় রক্ষা ক'র্ত্তে পারেন। কিন্তু তাঁর কাল একটা মকর্দ্দমা আছে, না গেলে প্রায় পাঁচ হাজার টাকার উপর তাঁর লোকসান হবে। তিনি তাও লোকসান দিয়ে এই

মুহূর্ত্তে আমায় টাকার বন্দোবস্ত ক'রে দিতে প্রস্তুত আছেন। ...দেব ক্ষতিগ্রস্ত কলের অর্দ্ধেক অংশ নিজে কিনে নিয়ে এই ক্ষতির অংশ গ্রহণ ক'রে আমায় রক্ষা ক'রতে চাইচেন। শুধু তাঁর একটী দাবী আছে, সে নিরু তুমি ভিন্ন উপায় নেই মা!" সৌৎসুক্যে বৃদ্ধ পিতা কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

নিরজার বুক এক অনিশ্চিত ভয়ে দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; তাহার ভাবনা-শুষ্ক মুখ অধিকতর শুখাইয়া গেল। ভগ্নস্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বাবা?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া রাজেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন—"তিনি তোমায় বিয়ে ক'রতে চান।"

নিরজা পিতার আলিঙ্গন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া দূরে সরিয়া গেল। তাহার কম্পিত বক্ষে হৃদপিণ্ডের দ্রুত আঘাতজনিত শব্দ সেই স্তব্ধ গৃহে যেন শব্দিত হইয়া উঠিল। দুই হাতে সে বিছানার প্রান্তটা চাপিয়া ধরিল।

রাজেন্দ্রনাথ সস্নেহে ডাকিলেন—"নিরু মা'।"

নিরজার রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে শব্দ বাহির হইল না। সে পিতার দিকে চাহিয়া কি বলিতে গেল, পারিল না।

বৃদ্ধ তাহার মাথায় হাত দিয়া আদর করিয়া কহিলেন,—"নিরজ ভেবে ছাখ্ মা, ভাল ক'রে ভেবে ছাখ্। তোর বাপ বড় বিপদেই প'ড়েচে। তোর ভাই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াবে। আমাদের উঁচু মাথা মাটিতে ঠেকবে।"

নিরজার দুই চোখে জল ছাপাইয়া উঠিল। রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া সে ডাকিল—"বাবা।"

রাজেন্দ্রনাথ বুকের উপর তাহার মাথাটা সস্নেহে চাপিয়া ধরিয়া উত্তর দিলেন—"কি মা?"

"বাবা, তুমি এই মত ক'রচো! পণ্য দ্রব্যের মতন তুমি আমায় দত্তর কাছে বেচবে?"

কাতর হইয়া রাজেন্দ্রনাথ বিছানায় শুইয়া পড়িয়া একান্ত অসহায়-ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"নিরো, নিরো, আমায় দগ্ধ করিস্‌নে।" তার পর একটু স্থির হইয়া বলিলেন—"যদি তুই তোর বাপ ভাইকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য তার স্ত্রী হ'তে পারিস্, আমি তাতে সৌভাগ্য ভিন্ন দুর্ভাগ্য ভাববো না। মোহিতের মত সুপাত্র পায় কে? অনেক তপস্যা থাকেতো ওকে জামাই আমি পাবো! তিনি জানেন তুমি সহজে তাঁকে বিয়ে ক'রতে মত দেবে না। আর আমিও তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ ক'রতে পার্ব্বো না। তাই এই সঙ্গে সেটা ঠিক করা হ'চ্ছে। তা মা তাঁকে কি বলবো বল্, আমি তা হ'লে লিখে পাঠাই, তিনি উত্তরের অপেক্ষা ক'চ্চেন।"

নিরজা উঠিয়া দাঁড়াইল, ত্বরিতস্বরে বলিল—"আচ্ছা বাবা, তাঁকে লিখে দাও 'তিনি তাঁর কাযের দাম যা চেয়েচেন তাই পাবেন।"

পিতা কন্যার ললাট চুম্বন করিয়া প্রসন্নচিত্তে কহিলেন—"মা, ঈশ্বর তোমায় চিরসুখী করুণ! আমি জানি আমার মেয়ে আমার অবাধ্য হবে না।"

নিরজা নিজের ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিছানায় পড়িয়া কাঁদিল। পিতার উপর অভিমানে মরা মাকে কাঁদিয়া ডাকিল,—নালিশ করিয়া বলিল, "এঘোর দুর্দ্দিনে একবার এসে আমায় দেখা দিয়ে যাও মা! বাবা আমার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দিয়েছেন!"

বিষপায়িনী নায়িকার চিত্রখানা বোধ করি তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়া থাকিবে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

যতীন্দ্রনাথ আসিয়া সবই শুনিল। শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা ব্রাহ্ম হ'য়ে এত বড় অ-ব্রাহ্ম কাণ্ডটা ক'রতে পারলে যামিনী? মিস্ রায় এতে কি সুখী হ'বেন?"

যামিনী নেহাৎ ভাল মানুষ,—গোবেচারী লোক। সে অর্দ্ধ-অপ্রতিভ ভাবে উত্তর করিল, "তা কি জানি। তা কেনই বা না হবে?"

"কেন তুমি এতে মত দিলে? তোমাদের এমন বাধ্য ক'রে তোমাদের ঘরের মেয়ে বিয়ে করার চেষ্টায় তোমাদের অপমান বোধ করা খুবই উচিত ছিল।"

এ তিরস্কারে লজ্জিত যামিনী শুধু বলিল—"বাবার জন্য, সবই আমাদের তখন ক'রতে হ'তো।"

যতীন্দ্র বারম্বার চোখ মুছিল, বলিল—"তোমাদের আপনার জনের চেয়েও বেশী ক'রে ভালবাসি,—তাই তোমাদের অপমানে আমারও অপমান মনে হয়।"

যতীন্দ্র নিরজার আত্মীয়পর এবং যতীন্দ্র নিজেও তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতকটা কৃতনিশ্চয় থাকিলেও মুখ ফুটিয়া কেহ এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন কথাই কহে নাই, আজও তাই কিছুই প্রকাশ পাইল না।

* * * * *

তার পর এক মাস পরে এক জ্যোৎস্না-রাত্রে আলোক উৎসব ও আনন্দের মধ্যে মোহিতকুমার দত্তর সহিত কুমারী নিরজা রায়ের শুভ-বিবাহ হইয়া গেল।

অমরনাথ বিস্ময়ে চোখ দুইটা ডাগর করিয়া বন্ধুর দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিল। বহুক্ষণ পরে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে বলিল—"তোমার অসাধ্য কাযই তা হ'লে জগতে নেই! ব্যাপারটা কি? এত বড় কাণ্ডটা কি ক'রে ঘটালে? আশ্চর্য্য!"

যূঁথিকা নিরজার কাঁধে মাথা রাখিয়া আহ্লাদে তাহার গলা জড়াইয়া বলিল—"বেশ হ'লো ঠাকুরঝি, এখানে সেখানে দু'জায়গায় আমি তোমাকে পাব। আমার মোহিতদাদার মতন স্বামী হবে তোমার খুব আনন্দ হ'চ্ছে;—না?"

নিরজা একটু লাল হইয়া বলিয়া উঠিল—"আমায় কিছু জিজ্ঞেস্ করিস্‌নে বোন!"

বিবাহের পর মিঃ দত্ত পত্নীর সহিত বিরলে সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পাইতেছিলেন না। সে ইচ্ছা করিয়া নিমন্ত্রিতাদের মাঝখানেই দিনটা কাটাইয়া দিল।

রাত্রে ফুলশয্যার পুষ্পবাসরে নবদম্পতির সাক্ষাৎ ঘটিল। নিরজার অত্যন্ত গম্ভীর মুখে কঠিন প্রতিজ্ঞার ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল। ফুলের গহনা তাহার গায়ে যেন মানাইতেছিল না।

প্রফুল্লচিত্ত মোহিতকুমার কাছে আসিয়া বসিলেন—"নিরু, নিরু, সে দিন তোমার সেই যে হাত কেটে গেছলো সেটার কোন চিহ্ন তোমার গায়ে আছে? আমার কিন্তু সেই সর্ব্বনেশে দিনটাকে অনেক আশীর্ব্বাদ ক'রতে ইচ্ছে যাচ্চে। মনে হ'চ্চে ভাগ্যে সে ঘটনাটা সেদিন ঘ'টেছিল তাই আজ আমি এত সুখী!"

নিরজার মুখের দিকে চাহিয়া সাদরে তাহার একটা হাত নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইলেন।—"তোমার শরীর কি তেমন সুস্থ নেই? মুখটা অমন দেখাচ্চে কেন?—নিরো, এসো শোবে এসো—"

নিরজা সবেগে নিজের হাত টানিয়া ছাড়াইয়া লইল, সক্রোধে বলিল "তুমি আমার কাছ থেকে স'রে যাও—" তাহার স্বর ভগ্ন ও কম্পিত।

মোহিতকুমার তাহার রাগে রাঙ্গা মুখের দিকে চাহিয়া একটু কৌতুকের হাসি হাসিলেন। সহাস্যমুখে তাহাকে নিজের খুব কাছে টানিয়া তাহার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া অন্য হাঁতে তাহার কম্পিত স্বেদাক্ত হস্ত ধরিয়া সস্মিতমুখে কহিলেন—"নিরজ, তুমি রাগ ক'রোনা, তোমার কাছে এখন পর্য্যন্ত আমি একটু লজ্জিত হ'য়ে আছি বটে, কিন্তু যতক্ষণ তুমি সব ব্যাপার না জানতে পারচো আমার এ লজ্জাও শুধু ততক্ষণেরই জন্য। তারপর—আমি জানি, আমি তোমায় যেমন ভালবাসি তুমিও আমায় ঠিক তেমনি ভালই বাসবে।"

"আমি!"—স্বামীর নিকট হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া নিরজা উঠিয়া দাঁড়াইল; দুই চোখে আগুন জ্বালাইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া সগর্ব্বে কহিল—"আমি তোমায় ভালবাসবো? জন্মেও কখন নয়।"

মোহিতকুমার স্ত্রীর দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।—ক্ষণ পরে কহিলেন—"কিন্তু নিরো—শুনেছি চুম্বক লোহাকেই টানে। আমার এ বুকভরা ভালবাসা কখনও প্রতিভাদানহীন হ'তে পারবে না, এ তুমি খুব বিশ্বাস কোরো।"

"যখন তুমি তোমার কাযের দাম চেয়েছিলে তখন কি এটা শুদ্ধ সর্ত্ত হ'য়েছিল? যা তুমি চেয়েছিলে, তাতো পেয়েছ—তার বেশী পাবার কথা তোমার নয়।"

"কিসের দাম?" আশ্চর্য্য হইয়া মোহিতকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি বোলচো?"

"কেন তাও কি স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিতে হবে?" নিরজার স্বর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। "তুমি আমার বাবাকে তাঁর অসময়ে—ঘোর বিপদের

সময়ে—টাকা দিয়েছ, আমি তাঁর দেনা শোধ ক'রেছি। আমি তার বদলে তোমার কাছে নিজেকে বিক্রী ক'রেছি?" ক্রোধে ও দুঃখে আবার তাহার কণ্ঠ-রোধ হইয়া আসিল।—"বেশ এখন থেকে তোমার আমার মধ্যে আর কোন প্রশ্নোত্তর নেই। আমাদের মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক কোন দিন ছিল না, কখন হবেও না। ইহা তুমিও খুব নিশ্চিত জেনে রেখো।"

মোহিতকুমারের মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল। তিনি গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন।

"হৃদয়ের সম্পর্ক নাই! দাম চেয়েছিলাম!"—"আচ্ছা আমি কি তোমায় জিজ্ঞেস ক'রতে পারি—কেন তুমি এমন সব উদ্ভট কল্পনা ক'রে মিথ্যে কষ্ট পাচ্চো? কেন মনে ক'রচো আমি আমার কাজের দাম তুলবো বলেই তোমায় বিয়ে ক'র্ত্তে চেয়েছিলেম? ছি ছি, এই কি তোমার যথার্থ বিশ্বাস? হৃদয়ের সম্পর্ক কার আবার কার সঙ্গে বিয়ের সাত বৎসর পূর্ব্বে থেকে থাকে? সামান্য শ্রদ্ধা স্নেহ থেকেই তো ক্রমে ক্রমে উহা অঙ্কুরিত হ'য়ে ওঠে। আর তাতেই তো তা এমন পূর্ণ ও গভীর হ'য়ে দাঁড়ায়। এতেই তার মাধুর্য্য!" তাঁহার আগ্রহ অবসাদে পরিণত হইয়া আসিয়াছিল, স্বরে গভীর বেদনা প্রকাশ পাইল।

"কল্পনা আমি কিসে ক'রচি? না হয় তুমি বড় লোক প্রতিবাসী,—না হয় লোকে তোমায় বুদ্ধিমান ব'লে তারিফ করে, তাই না হয় বিপদের সময় আমরা তোমার সাহায্য চেয়েই ছিলেম,—তোমার স্মরণাপন্ন হ'য়েই ছিলেম, তাই ব'লে কি না তুমি সেই সময় বাবাকে বাধ্য ক'রে ফেল্লে? নিজে নিজের সততার দাম চেয়ে ব'সলে! যদি বাবা তোমার সদ্‌গুণে মুগ্ধ হ'য়ে তোমার কাজের পুরস্কার স্বরূপে—আমায় নিজে যেচে,—যেমন সব বাপেই করে—তেমনি তোমায় দান ক'রতেন, তাহ'লে আমি তোমাকে হয় তো শ্রদ্ধা ভক্তিও ক'র্ত্তে পার্ত্তেম। এত বড় স্বার্থপরকে কেউ

কখনও ভালবাসা চুলোয় যাক—স্বামী ব'লে শ্রদ্ধা ক'রতেই পারে? তুমি নিজেই বল দেখি?”

“নিজের মূল্যটা বড্ডই বেশী ধ'রচো নিরজা”,—ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া মর্ম্মাহত মোহিতকুমার বলিলেন—“যদি তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো তা'হলে আমি বলচি, আমি তাঁকে মোটেই বাধ্য করিনি, তিনি নিজেই আমায় তোমাকে দিতে চেয়েছিলেন। আমি প্রথমে যখন তোমায় দেখি তখনই তোমার সৌন্দর্য্য সরলতা ও দয়া তোমার প্রতি আমার মন আকৃষ্ট করে, এ কথা আমি অবশ্য অস্বীকার করি নে। কিন্তু ঈশ্বর জানেন আমি কখনই তোমার উপর লোভ করিনি। আমি উপন্যাসের নায়কও নই আর বড়লোকের ঘরের নিষ্কর্ম্মা ছেলেও নই। আমি জন্মাবধি প্রাণান্ত পরিশ্রমকর কাজেই জোড়া আছি। মনের মধ্যে ও রকম দুর্ব্বলতা পুষে বেড়ান আমার চলে না। শুধু আমি তোমায় উচ্চাদর্শের কোমল প্রকৃতির রমণী ভেবে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেছিলেম;—অবশ্য আমি ভুল ক'রেছিলেম—তাও না হয় তুমি স্বীকার করাচ্চো দেখচি! তার পর তুমি সে দিন কি রকম ঘৃণা ক'রে আমায় শুধু শুধু উপেক্ষা ক'রলে,—কেন?—না আমি নিজের উপার্জ্জিত টাকায় যতীন ঘোষের নিলামে বিক্রীত সম্পত্তি কিনে নিয়েছি—মাত্র এই আমার অপরাধ! তাতেও আমি কিছু বিরক্ত হইনি, দুঃখিত হয় তো একটু হ'তে পারি।—তোমার বাবা যখন আমায় ডেকে পাঠালেন,—আমি শোনবামাত্র নিজের ক্ষতি স্বীকার ক'রেও হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর সাহায্য ক'র্ত্তে সম্মত হ'লেম। কলেক্টর আমার বিশেষ বন্ধু, তাঁকে অনুনয় ক'রে বিপদের কথা জানিয়ে তখনি টেলিগ্রাম মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাই;—সে সব তুমি জানই যে কত চেষ্টায় তোমাদের জমীদারী ও কলের ক্ষতি আমায় শুধরে তুলতে হ'চ্চে। সে সব আমি প্রতিদানের আশা না ক'রেই স্বীকার ক'রেছিলেম। আর এ ভদ্রলোক মাত্রেই ক'রে থাকে। এতে আমার

কিছু অসাধারণত্ব প্রকাশ পায়নি তাও আমি জানি। পুরস্কারের কথা আমার মনেও আসে নি। তোমার বাবাই আমায় ব'ল্লেন—'তোমার যে আমি এত ক্ষতি ক'রবো কি দিয়ে আমি এর শোধ দেবো? আমার এমন কি আছে যা দিয়ে আমি তোমার কিছু ঋণ শোধ ক'রতে পারি।' তুমি,—যতই আমায় মনে করো মন্দ, যথার্থ আমি এমন নীচ নই যে তাঁকে তখন বাধ্য ক'রবো। আমি বল্লেম—'আমি আপনার যামিনী অমরের বন্ধু, আমি আপনার পুত্র, আমার দ্বারা যদি আপনার কিছু উপকার হয়, সে আমারই সৌভাগ্য, তার জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না।' কিন্তু তিনি তো সত্য তোমার মত স্বার্থপর নন, পরের কাছে কেন তিনি চিরজীবনটা কুণ্ঠিত হ'য়ে থাকবেন? তিনি বল্লেন—'মোহিত, তোমায় দেবার আমার আর কিছু নেই—শুধু আমার নিরজা আছে, তাকে আমি যাকে তাকে প্রাণ ধ'রে দিতে পার্ব্বো না, যদি তুমি তাকে নিয়ে আমার হও তাহ'লেই আমি মন খুলে তোমার সাহায্য নিতে পারি;—আর, সকল দিকেই সকল বিপদ হ'তে উদ্ধার হই।' নিরজা, সাধ করিয়া আর কে নিজের জীবনের আনন্দ আলোক ত্যাগ ক'রতে পারে? কিন্তু এই স্বার্থপর আমিই তাও ত্যাগ ক'রতে চেয়েছিলাম, তাঁকে ব'লেছিলাম—'কিন্তু তিনি কি সম্মত হবেন? তাঁর অমতে আমি তাঁকে জোর ক'রে বিয়ে ক'রতে চাই নে।' তোমার বাবা সে ভার নিজের হাতে রেখে ব'ল্লেন 'সে আমার অবাধ্য হবে না। তা ভিন্ন আজ সে তোমায় চিন্‌বে। যাকে মহৎ ব'লে জানি—তাকে আমাদের ভালবাসতে দেরী হয় না। মোহিত, আমার জামায়ের কাছে আমি ঋণী হ'তে পারি, অন্যের কাছে পারি নে।' তিনি ঠিক ঠিক যা ব'লেছিলেন, সেই কথাগুলিই আমি তোমায় বলচি,—নিজের বড়াই ক'রে কিছুই বাড়িয়ে বলা হয়নি। এতে বুঝে দেখ আমার কতখানি দোষ।"

একটুখানি থামিয়া তিনি পুনশ্চ বলিলেন—"এর ভেতর তুমি 'সর্ত্ত' দেখলে, 'কাজ বিক্রী' দেখলে, কতই দেখলে—"

"নয়ই বা কিসে?" উত্তেজিত হইয়া নিরজা বলিয়া উঠিল—"আমি তোমায় কতটুকুই বা জানতুম, আমি তোমায়—তুমিই তো ব'ল্‌চো যে—স্বপছন্দই ক'রতুম, আমি কখনও স্বপ্নেও জানতুম না যে তোমার কাছে আমায় এমন ক'রে শরীর বিক্রী ক'রতে হবে। বাবা না হয় বলেই ছিলেন; কিন্তু তুমি সব জেনে শুনে আমার অদৃষ্টের উপর শনি-গ্রহের মত এসে প'ড়লে কেন? আমি তো কাকেও কখন বিয়ে ক'রবো মনে ভাবিনি,—বিশেষ এমন বাধ্য হ'য়ে।" উচ্ছ্বসিতবক্ষে কম্পিত-পদে দুই পা সরিয়া গিয়া দেয়ালে ভর রাখিয়া স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিল,—"তুমি টাকা ও পরিশ্রমের দ্বারা আমার বাবাকে যে সাহায্য ক'রেছ তার দামতো তুলে নিয়েছ। আর তো তোমার দাবী করবার কিছু বাকি নেই? এই পর্য্যন্তই থাক।"

"কিছু দাবী নেই?" নিষ্ঠুর বিদ্রুপের সহিত মোহিতকুমারও তাহার আহত চিত্তের তীব্র জ্বালা ঢালিয়া আঘাতকারিণীকে কি একটা তীক্ষ্ণ কষাঘাত করিতে গিয়া তাহা মুহূর্ত্তে সম্বরণ করিয়া লইলেন। কেবল মাত্র কহিলেন—"এ রকম যে হ'তে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না! তুমি কেন বিয়ের আগে যখন আমি তোমায় তোমার মত আছে কি না জিজ্ঞাসা করি—সে সময়ও একথা বল্লে না?"

পরে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"শোন নিরজা, যা ভুল আমি ক'রে ফেলেছি তা আর শোধরাবার তো পথই নাই, থাকলে তাও করা যেত। এখন আমার এ অপরাধের দণ্ড আমায় মাথা পেতে নিতেই হবে। আর যেটুকু পারা যায় তার প্রায়শ্চিত্তও ক'রতে হবে। এ ভিন্ন আর উপায় নাই! তাই—"

"এখন আর কি—"নিরজা কি বলিতে গেল কিন্তু ক্রোধে অভিমানে তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। সে দ্রুতপদে জানালার

নিকট গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল এই রকমে ইহার সহিত কথা কাটাকাটি করার চেয়ে নিজেকে কাটিয়া কুটি কুটি করাও ভাল।

"আমায় বলতে দাও,"—মিঃ দত্ত কৌচ ছাড়িয়া উঠিয়া পত্নীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন নিরজা,—তুমি হরিপুর ষ্টেটের জমীদার-পত্নী, লোকের কাছে তুমি 'মিসেস্ দত্ত,' কিন্তু আজ থেকে আমি সত্য সত্যই তোমার কাছে কিছুই দাবী ক'রবো না। না তোমার ভালবাসা, না তোমার শ্রদ্ধা, আর না তোমার সঙ্গ। যতদিন না তুমি নিজে যেচে ভালবেসে আমায় তা দেবে—"

"তা আমি কখনই দেবো না—" নিরজা সগর্ব্বে ফিরিয়া বলিল—"তোমার সাহস তো বড় মন্দ নয়! তুমি কল্পনা ক'র্চ্চো যে আমি তোমায় কখনও ভালবাসবো? তোমাকে,—এই আত্মসুখসর্ব্বস্ব স্বার্থপর দস্যুকে!"

"আচ্ছা তাই ভাল, এও আমার আর এক সর্ত্ত নিরজা!"

মোহিতকুমার জোরের সহিত এই কথা বলিলেন। তাঁহার চির-হাস্যময় মুখ অপমানে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি স্থিরকণ্ঠে পুনরায় কহিলেন—"আমি প্রতিজ্ঞা ক'রচি দেখো আমি এ রাখতে পারি কি না—যদি কখনও ভালবেসে কাছে ডাকো,—তাহ'লেই কাছে আসবো, না হ'লে আমার তোমার মধ্যে চিরদিনের জন্য এই ব্যবধান থাকলো!"

অপমানিত বক্ষ হইতে ফুলের মালা খুলিয়া ভূমে নিক্ষেপ করিয়া মোহিতকুমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। শুক্লাত্রয়োদশীর চাঁদ তখন তাঁহার সবটুকু জ্যোৎস্না ছড়াইয়া কি হাসিটাই না হাসিতে-ছিলেন! রজনীগন্ধার গন্ধে মাতিয়া বাতাস মাতালের মত লতায় লতায় ঢলিয়া পড়িতেছিল। অদূরে যতীন্দ্রনাথের বাসায় তখন ও

রাত্রের মজলিস বন্ধ হয় নাই। তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠ হইতে সঙ্গীতধ্বনি উঠিয়া এসরাজের মিষ্ট স্বরের সহিত সেই সুপ্ত স্তব্ধ রজনীর অঙ্গে অমৃতধারা ঢালিয়া দিতেছিল। নিরজা শুনিল তিনি গাহিতেছেন—

"আর তো হোলনা দেখা, এ জগতে দোঁহে একা,
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা তীরে;
মধু যামিনী রে—"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বড় দিনের বন্ধে নিরজা কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাল ছিলি তো নিরু! এত রোগা হ'য়ে গেছিস কেন মা? মোহিত ভাল আছে?"

সে মুখ ভার করিয়া অভিমানের সহিত উত্তর করিল—"হাঁ।"

পিসিমা খুসি হইয়া প্রতিবাসিনীদের তাহার গহনার রাশি দেখাইয়া ও জামাতার ঐশ্বর্য্যের গল্প করিয়া তাহাদের ঈর্ষান্বিত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রীর গহনা বস্ত্রের প্রতি ঔদাসিন্যের জন্য তাহাকে একটু তিরস্কার করিতেও ছাড়িলেন না।

এত যে জামাই ভালবাসিয়া দিয়াছে, তা সে পোড়ামেয়ে কিছুই কি চাহিয়া দেখে না। এ বয়সে এ বৈরাগ্য কি মানায়? জামাই বা ইহাতে কি মনে করিবেন!

জুঁই আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল—"নিরুদিদি, তোমাদের কথা সব বলো। হুঁ, না ব'ল্লে ছাড়বো কি না! আমার কথা সব শুনে নেওয়া হ'লো, নিজের কথা এখন কিছুই ব'লবে না বুঝি, বাঃ!"

নিরজা ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—"সে তুই শুনে উঠতে পার্ব্বি না, সে সব আমাদের অনেক কথা,—তোদের মতন কি দুটি চারটি।"

"আচ্ছা বেশী না হয় নাই হ'লো—কিছুও তো বল।"

"নেহাৎ শুন্‌বি? তবে কিছু কিছুই শোন,—এই 'মিসেস্ ঘোষ তোমায় যেতে অনুরোধ ক'রেছেন,' 'শুনেছ বোধ হয় জষ্টিস্ চন্দ্র মাধব ঘোষ রিটায়ার ক'রচেন?' 'সুরেন্দ্রবাবু কাল যা বল্লেন সে বিষয়ে তোমার কি মত? আমার মতের সঙ্গে তা খুবই মিলে গ্যাছে।' ইত্যাদি ইত্যাদি আরও কিছু শুনবি?"

জুঁই হাসিয়া বলিল—"যাও! তা বইকি, তুমি কিচ্ছু ব'ললে না, আমায় ফাঁকি দিলে।"

নিরজাও হাসিল "সত্যিরে, সব কথাই ঐ রকম! আমরা কি তোদের মত ছেলেমানুষ?"

যামিনী, অমর দুজনেই জিজ্ঞাসা করিল—"মিষ্টার দত্ত যে এলেন না?"

"কে জানে" বলিয়াই নিরজা সামলাইয়া লইল। "তিনি তাঁর কাপড়ের কল বসাবার চেষ্টায় ব্যস্ত হ'য়ে র'য়েছেন।"

ছুটি ফুরাইলে নিরজার শাশুড়ি বলিলেন—"বৌমা, মহি একলা আছে, আমরা বাড়ী যাই চলো।"

সে বলিল—"তুমি তো যাচ্চো মা, আমি এখন এখানেই থাকবো, পুষ্প বরং আমার কাছেই থাক্।"

মাতা ফিরিয়া গিয়া পুত্রকে বলিলেন; শুনিয়া পুত্র কহিলেন—"বেশতো মা, থাক্‌না।"

এই প্রেমহীন বন্ধন তাঁহার যেন ক্রমেই কষ্টের কারণ হইয়া উঠিতেছিল। নিজের স্ত্রীকে পরের মত ব্যবহার করা, আবার লোকের কাছে আত্মমর্য্যাদা রাখিয়া চলা তাঁহাকে ক্রমশই যেন ক্লান্ত করিয়া ফেলিতেছিল। তাই দুদিন জিরাইতে পাইয়া তিনিও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বর্ত্তাইলেন।

কিন্তু সে দুদিন।—দুদিন পরেই এক অদৃশ্য আকর্ষণ যেন তাঁহাকে তাহার দিকে টানিতে লাগিল। সেখানে আর তিনি তিষ্ঠিতে পারিলেন না। নিরজা তাঁহাকে দেখিয়া ভালমন্দ কিছুই বলিল না। সে তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়া বুঝিয়াছিল সে যদিও তাঁহাকে নিজের শত্রু ভিন্ন মিত্র মনে করিতে পারে না, কিন্তু তথাপি সে শত্রুও যে বেশ একটু শ্লাঘনীয় শত্রু; তাও যেন অস্বীকার করা যায় না। ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজের মহা শত্রুর সেই দীপ্ত নেত্র মর্য্যাদাপূর্ণ অথচ সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ব্যবহার এবং সেই সুপ্রচুর কণ্ঠস্বর চোখে পড়ে;—কানে ভাসে। তাহার পিতা জামাতাকে পাইয়া খুব খুসী হইলেন। শ্যালকেরাও সন্তুষ্ট হইল।

এখানে দুদিন সেখানে দুদিন করিয়া মোহিতকুমারের কায কর্ম্মের খুব ক্ষতি হইতে লাগিল। কিন্তু স্ত্রীকেও তো তাই বলিয়া আর কিছু বলিতে পারেন না,—কেন না মহাভারতের শান্তনু রাজার মত তিনি স্ত্রীকে যে পূর্ণ-স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কথা বলিয়া নিজেকে নিচু করিয়া ফেলিতে তাঁহার অপমান বোধ হয়। আর যে স্ত্রী—স্ত্রীত্ব গ্রহণ করিল না, তাহার কাছে আবার কিসের লাভ লোকসানের হিসাব দাখিল করা? কাজেই মুখ বুজিয়া ক্ষতিই সহ্য করিতে লাগিলেন।

এমনি করিয়া কয়মাস কাটিয়া পূজার বন্ধ আসিয়া পড়িল, তিনিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

যতীন্দ্র নাথের অবস্থা এখন বেশ সচ্ছল। তিনি এখান হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে লক্ষণপুরে বাড়ী কিনিয়াছেন। বেশভূষারও পারিপাট্য বাড়িয়াছে। আজকাল প্রায়ই অমরনাথের বাসায় ও নিরজার পিত্রালয়ে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য তিনি পূর্ব্বেই স্বেচ্ছায় রাজেন্দ্রনাথের চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

এক দিন মিঃ দত্ত স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"চাকরেরা দেখলেম পশ্চিম মহলের ঘরগুলা সাফ ক'রচে, তারা ব'ল্লে 'মেম সাহেব হুকুম দিয়েছেন, একজন বাবু আসবেন'। কে আসবেন জানতে পারি কি?"

নিরজা হস্তস্থিত বোনার প্যাটার্ণে অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্ত থাকিয়া মনোযোগের সহিত এক কাঁটা হইতে অন্য কাঁটায় তুলিতে তুলিতে মুখ না তুলিয়া উত্তর করিল—"যতীন্দ্র বাবু।"

অকস্মাৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়া মিঃ দত্ত বলিয়া উঠিলেন—"কেন, আমার বাড়ী তিনি কেন?"

নিরজা যথেষ্ট সংযতভাবে হাতের কাযের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সহজভাবে কহিল—"কেন, আসতে নেই? দিন আষ্টেক এসে থাকবেন ব'ল্লেন, বারণ ক'রতে তো আর পারি না। প্রতিবার অমরদাদার বাড়ী থাকতে তাঁর লজ্জাবোধ হয় তাই—"

রুষ্ট বিদ্রূপের সহিত মোহিতকুমার দ্রুতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"তাঁর যদি লজ্জা থাকতো তাহ'লে তিনি এখানে মুখ দেখাতেন না। আর তুমিও তাঁকে—"

সক্রোধে মুখ তুলিয়া নিরজা গর্জ্জিয়া বলিল—"দেখ তুমি আমায় মিথ্যে মিথ্যে অমন ক'রে অপমান ক'রো না। তোমার মন অমন ছোট কেন? আমার ছোট বেলার বন্ধুকে যদি আমি দুদিন আমার বাড়ী নিমন্ত্রণই ক'রে থাকি, আর সে ভদ্রলোকও যদি নিজেই আমার

অতিথি হ'তেও বা চায়—তাতে উভয়তঃ নির্ল্লজ্জতা তুমি কি দেখলে শুনি? তাঁর মত ভদ্র যদি তুমি হ'তে তাহ'লে রক্ষা ছিল না। তিনি তোমার ক'রেছেন কি যে তুমি তাঁকে দেখতে পারো না?"

"সবাই কি সবাইকে সমান চোখে দেখে? একজন হয়ত যাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে আর একজন হয়ত তাকে ঘৃণা ক'রে চেয়েই দেখে না।"

"যতীন্দ্রবাবুর জায়গায় দাঁড়িয়ে বুঝি নিজের পূর্ব্বাবস্থা মনে পড়ে, তাই তাঁকে দেখতে পারো না।"

তীব্র শ্লেষের সহিত মিঃ দত্ত হাসিয়া উঠিলেন—"ওঃ অমন বড়-লোকের ছেলে হ'য়ে না জন্মে, দরিদ্রঘরে জন্মাতে পেয়ে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, তাতে হিংসা করবার কিছু দেখিনে।"

নিরজা নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া চুপ করিয়া থাকিল। পরে বলিল—"কিন্তু আমি যে তাঁকে থাকবার মত দিয়েছি, সে কথা আমি এখন কেমন ক'রে ফেরাবো? আমার লজ্জা রাখবার যে তাহ'লে জায়গা থাকবে না।"

সে কথার উত্তর না দিয়া মিঃ দত্ত সদৃঢ়ভাবে কহিলেন—"নিরজা, আমি বলচি তাঁর এখানে আট দিন থাকা হবে না। এক দিন, এক বেলা, এক ঘণ্টা,—যত অল্প হয় ততই মঙ্গল। তোমার কাজের উপর কথা কইতে আমার ইচ্ছা হয় না, আমি সহজে কইও না, তা'কি তুমি বুঝতে পারো না?—কিন্তু সেই যে কুক্ষণে কয়টা মন্ত্র পাঠ ক'রেছিলাম, তারই জন্য সময় বিশেষে চুপ ক'রে থাকা চলে না, তাই আমায় এমন জেদ ক'রেই আজ ব'লতে হ'চ্চে যে যতীন ঘোষ আমার বাড়ীতে আট দিন থাকতে পাবে না,—কিছুতেই না।"

নিরজা স্বামীর সজোর আপত্যের বিরুদ্ধে বেশী তর্ক বিতর্ক করা যুক্তিসঙ্গত নয় বুঝিল। সে মুখ নিচু করিয়া মনের উচ্ছ্বসিত ক্রোধ ও

অভিমান প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—"আমি ব'ল্‌তে পার্ব্বো না। আমি তো জানতেম না যে এ বাড়ীতে আমার কোন অধিকার নেই, তা হ'লে—"

এ কথার যে সহজ উত্তর ছিল, সে কথা না তুলিয়া মিঃ দত্ত বলিলেন —"আচ্ছা না হয় আমিই ব'লবো যে কা'ল হঠাৎ আমায় কলকাতায় যেতে হবে।—কি বলো ?"

"যা ভাল বোঝ করো, আমি কি জানি।"—বলিয়া সে রুদ্ধ রোষে হাতের বোনাটা ছুঁড়িয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া, চোখের জল চাপিতে চাপিতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শরতের মেঘে দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে না পড়িতেই থামিয়া গিয়া অস্তগমনোন্মত সূর্য্যের ঝিক্‌মিকে রশ্মি প্রকাশ হইয়া পড়িল। বৃষ্টির জল গাছের পাতা হইতে টুপটাপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। তেমনি করিয়া বোঁটাখসা সিউলীফুল খসিয়া পড়িয়া গাছের তলায় যেন হলদে ফুল করা সাদা চাদর বিছাইয়া দিয়াছিল। বৃষ্টির জন্য এখনও পাড়ার মেয়েরা আসিতে পারে নাই। এখনি তাহারা ডালা হাতে লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়া ছোট ছোট হাতে মুঠা মুঠা করিয়া ঝরো ফুল কাপড় রং করিবার জন্য কুড়াইয়া লইয়া যাইবে।

মিঃ দত্ত যতীন্দ্রনাথ আসিবার কিছু পরেই কোথায় বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। নিরজা উত্যক্ত মনে রাগে রাঙ্গা হইয়া কোন-

মতে অতিথিসৎকার করিতেছিল; তাহার মনে আর এক বিন্দু উৎসাহও ছিল না। যাঁর অতিথিপরায়ণতা দেশবিখ্যাত, তাহার বন্ধু বলিয়াই না তিনি ইহার 'পরে এমন কঠিন! তাহার উপরই না হয় রাগ আছে, বন্ধু কি করিল? সে বেচারী তো অপর সকলেরি মত একজন বাহিরেরই লোক। ইহাকে এমন করিয়া তাচ্ছল্য দেখান কি উচিত?

বৃষ্টি থামিলে যতীন্দ্রনাথ বলিল—"এসো আমরা বাগানে একটু বেড়াই গে। মিষ্টার দত্ত যে বাগানটার খুব উন্নতি ক'রেছেন দেখছি!"

নিরজার মনে সুখ ছিল না, সে স্বামীর কথাই ভাবিতেছিল; তাহার উপস্থিত থাকা যে খুবই উচিত ছিল, হাজারটা যুক্তি দিয়া মনে মনে তাহাই সে সপ্রমান করিতেছিল। তাঁহার কোন বন্ধু বা বন্ধুপত্নী বাড়ী আসিলে সে কবে কবে শরীর মনের যথেষ্ট অসুস্থতা লইয়াও তাঁদের সম্বর্দ্ধনার কিছু মাত্র খুঁৎ রাখে নাই সে কথাও সে নজীরস্বরূপ খুঁজিয়া রাখিতেছিল। এ লইয়া আজ দেখা হইলে সে স্বামীকে দুইটা কথা না শুনাইয়া অমনি ছাড়িয়া দিবে না তো। যতীন্দ্রের আমন্ত্রণে কি করে, অগত্যাই নিরুদ্যমভাবে তাঁহার অনুসরণ করিল। যতীন্দ্রনাথ হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া তাঁহার দিকে চাহিল।—"আমি তোমায় 'আপনি' ব'ল্‌তে পারি না ব'লে কি তুমি বিরক্ত হও? আমার মুখে 'আপনি' ব'লতে আটকে যায়, চিরকালের অভ্যাস তাই 'তুমি' ব'লে ফেলি। কিন্তু তুমি যদি পছন্দ না করো তাহ'লে না হয় নতুন ক'রে 'আপনি' ব'লতেই চেষ্টা ক'রবো—কি বল মিসেস্ দত্ত?"

নিরজার আকণ্ঠললাট লাল হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে সে উত্তর করিল—"না আমি নিজেই যখন নিজের পুরনো অভ্যাস ছাড়তে পারিনে তখন তোমার বেলা 'আপনি' বলা পছন্দ করি কি ক'রে? আমাদের তো আজকের দেখা প্রথম নয় যতিবাবু! চিরপরিচিতের কাছে

অপরিচিত ব্যবহার কি কেউ ভালবাসে ?"—বলিয়াই পূর্ব্বকথা স্মরণে তাহার গোলাপি গণ্ড আরক্ত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কথা বদলাইবার ইচ্ছায় নিরুৎসাহ মনেও উৎসাহ আনিবার চেষ্টা করিয়া একটা ফুটন্ত গোলাপ ছিঁড়িয়া লইয়া সাগ্রহে কহিল—"দেখ যতিবাবু, এ ফুলটা কত বড় হ'য়েছে !"

ফুল লইয়া একবার আঘ্রাণ করিয়া নিজের বুকের বোতামে সেটা গুঁজিয়া যতীন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। "এই গাছের প্রথম ফুল ফুটতে আমি তোমায় তখনি গিয়ে দিয়ে আসি সে কথা তোমার মনে আছে ?"

আবার সেই পূর্ব্বকথা ! আবার সে লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল। ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া সে আপাদ মস্তক পুষ্পখচিত একটা কামিনী গাছের শাখা নাড়া দিয়া তাহা হইতে বৃষ্টির জল ও ফুলের পাপড়ি ভাঙ্গা ঝরাইয়া ফেলিল।—"চলো আমার Conservatoryতে বেড়িয়ে আসিগে, যাবে ?"

"যাবো বইকি এসো না। বাঃ বেশ সুন্দর হ'য়েছে তো এটি ! এটা কি ফুল ? এ পাতাটার তো বেশ বাহার। মিসেস্ দত্ত, তোমরা কাল ক'ল্‌কাতা যাচ্চো ?"

যতীন্দ্রনাথ হঠাৎ নিরজাকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিয়া তাহার উত্তর আশা করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। নিরজার মন হইতে অল্পে অল্পে যে বিরক্তির দাগ মুছিয়া আসিতেছিল, এই কথায় তাহা আবার প্রবল হইয়া উঠিল। সে বুঝিল স্বামী অতিথিকে এ কথা বলিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিতে পারেন নাই। সে ঈষৎ তীব্রভাবে উত্তর করিল "কে জানে !"

চতুর যতীন্দ্রনাথের ব্যাপার বুঝিতে বাকি ছিল না, তথাপি বিস্ময়ের ভান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি তা জান না, সে কি রকম কথা ?

আচ্ছা, মিসেস্ দত্ত, তোমার স্বামী কি তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন না?"

"না মোটেই না"—স্বামীর আজিকার ব্যবহার নিরজার অঙ্গে কাঁটার মত ফুটিতেছিল। তিনি যে তাহার নিমন্ত্রিত বাল্যবন্ধুকে এমন অবহেলার সহিত—অপমানের সহিত—প্রত্যাখ্যান করিলেন, ইহাতে সে তাঁহার উপরে অত্যন্ত রাগিয়াছিল। তাই হিতাহিত জ্ঞানও তাহার মনের মধ্যে তখন ছিল না,—তা নহিলে আত্মমর্য্যাদায় পূর্ণদৃষ্টি নিরজা এমন কথাটা কাহারও সাক্ষাতে স্বীকার করিয়া নিজের মর্য্যাদাকে কখন খাট করে না।

"নিরজা, আমি তোমার দুঃখে আন্তরিক দুঃখিত হ'চ্ছি, আমারও সেই সন্দেহ বরাবর হ'তে ছিল; সাহস ক'রে এ কথা তোমায় কোনদিনই জিজ্ঞেস ক'রতে পারি নি। কিন্তু ছোটবেলা থেকে যে তোমার খেলার, পড়ার, সুখের সঙ্গী ছিল, আজ কি সে তোমার দুঃখে একটু সহানুভূতি জানাতেও পারে না?"

নিরজার হৃদয়োত্থিত দীর্ঘনিশ্বাস ধীরে ধীরে বাহিরের বাতাসে মিশিয়া গেল। "যতীবাবু, আমি তোমায় প্রাণের সঙ্গে বিশ্বাস করি তা'কি তুমি জানো না? আমি জানি তুমি আমার যথার্থ বন্ধু—"

যতীন্দ্রনাথ নিরজার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"তবে তুমি আমার কথা মধ্যে মধ্যে স্মরণ করো? আমায় চিরকাল কি মনে থাকবে নিরো? না দু'দিন পরে ভুলে যাবে?"

নিরজা দোদুল্যমান লতা হইতে একটা ফুল ছিঁড়িয়া তাহা ছিন্ন করিতে করিতে উত্তর করিল—"সংসারে এমন কি আমি পেয়েছি যে তোমাদের মতন বন্ধুদের ভুলে যেতে পারি? অমরদাদাকে ও তোমাকে আমি দাদার মতই প্রায় সমান চোখে দেখি। সকল সময়ই আমি তোমাদের কথা মনে করি—"

যতীন্দ্রনাথ আর একটু কাছে আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিল।—“নিরো, নিরো, মিষ্টার দত্ত আমাদের চিরদিনের আশা ভঙ্গ ক'রে দেবার জন্য কোথা থেকে আমাদের মাঝখানে দস্যুর মত এসে প'ড়ে আমাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলে? আমাদের জীবন চিরকালের মত দুঃখের কালো মেঘে ভ'রে গেল!”

এক মুহূর্ত্ত নিরজা স্থির হইয়া রহিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সে ভাব তাহার দূরে চলিয়া গেল। নিজের হাতটা সে সবেগে টানিয়া লইয়া কহিল—“ওসব কথা তোমার কইবার কি অধিকার? তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ যে তা থেকে ‘বিচ্ছিন্ন’ করা'র কথা তুমি ব'লচো? তখনও তুমি আমার বন্ধু—বাল্যবন্ধু ছিলে, এখনও তাই আছ। তিনি তোমার কি ক্ষতিটা ক'রেছেন?”

যতীন্দ্রনাথ তাহার আয়ত নেত্রদ্বয় নিরজার বিবর্ণ মুখের উপর স্থাপিত করিয়া মধুরস্বরে কহিল—“অধিকার? কেন নিরো বন্ধুর কি বন্ধুর সুখ দুঃখের কথা কইবার অধিকার থাকে না? তা ভিন্ন নিরো, আমি কি জানি না মনে করো এক সময়ে তুমি আমায় কত ভালবেসেছিলে? সেই স্মৃতিই আমাকে সাহস দিয়েছে। নিরো, শুধু আমাদের সেই ভালবাসার স্মৃতি—”

একটা উত্তপ্ত রক্তস্রোত নিরজার মাথার ভিতর ঢেউয়ের বেগে আছড়াইয়া গিয়া পড়িল। তাহাতে তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত যেন লাল হইয়া উঠিল। “আমাদের ভালবাসার স্মৃতি!—ছি ছি যতীবাবু, ছি ছি, আমি স্বপ্নেও কখন মনে ক'রতে পারিনি, যে তুমি আমার সে কৌমার প্রাণের অম্লান বন্ধুত্বকে অমন বিকৃত ক'রে মনে রেখে দেবে! আমরা কি নভেলের মানুষ? ছি ছি ওকথা তুমি আর কখন মুখে ছেড়ে—মনেও এনো না।”

কম্পিত নিশ্বাসে সে বলিল—"নিরো, না না অস্বীকার ক'রোনা, তুমি আমায় ভালবাসতে।—আমি তোমায় প্রাণের চেয়েও ভালবাসি—তাও তুমি না জান তা নয়, তবে কেন সে পূর্ব্বস্মৃতির অমৃতটুকু থেকে আমায় অমন ক'রে বঞ্চিত ক'রতে চাইচো?—"

"তুমি আমায় 'নিরো' ব'লো না। আমি 'মিসেস' দত্ত। আমায় 'নিরো' বলবার অধিকার তোমার নাই।" নিরজা ক্রমেই অধিকতর উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, ক্রুদ্ধস্বরে সে ঘনকম্পিত শ্বাসে বলিতে লাগিল—"যখন তুমি অত বড় একটা কথা তুল্‌তে সাহস ক'রেচো, তখন দেখছি একটা মস্ত বড় আমূল ভ্রান্তি তুমি মনে পুষে নিজের স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে বেড়াচ্চো। আমি তোমায় শ্রদ্ধা করিচি, স্নেহ করিচি, সে তোমায় ভাল ভেবে, বন্ধু ভেবে, অন্য ভাবে—আমরা হাজার হই বাঙ্গালীর মেয়ে;—আমাদের কোন পরপুরুষের দিকে চাওয়াও সম্ভব নয়। এখনও তোমায় ভালবাসতুমনা;—তা ব'ল্‌তে পারি নে, কিন্তু সেটা যে শুধু ভাইএর প্রতি বোনের ভালবাসা, তা আমি শপথ ক'রেই ব'লতে পারি। কিন্তু এখন—" গর্ব্বিতভাবে মাথা তুলিয়া বলিল—"কিন্তু এখন বুঝেছি যে তুমি কি, তুমি কতো নীচ! 'আমার ভালবাসার' সম্বন্ধে তুমি যে স্বরে কথা ব'ললে তাতে আমার সম্বন্ধে এখনও তুমি অন্য কিছু ভুল বুঝে আছ দেখতে পাচ্ছি, সে ভালবাসা এখন যাঁর পাওনা আমি তাঁকেই দিয়েছি—"

যতীন্দ্রের মুখে একটা বিকৃত ভাব প্রকাশ পাইল।—ব্যঙ্গ করিয়া সে কহিল—"তিনি কে? তোমার স্বামী অবশ্যই নন?"

ক্রোধে নিরজার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। রাগে দুঃখে মনে পড়িল স্বামী তাহার এই অপমান ঘাড়াইতে আসিয়া নিজেই অপমানিত হইয়া গিয়াছেন। কি স্বামীকে সে কি অগ্রাহ্য করিয়া চাহিয়া দেখে নাই। নিজের কথা মনে হওয়ায় সে যেন অবাক হইয়া গেল। এসব বুদ্ধি কাহার?

সে না আর এক জন ? সগর্ব্বে উত্তর দিল—"তিনি আমার পূজনীয় স্বামী ব্যতীত আর কে হওয়া সম্ভব যতী বাবু ?"

ঈর্ষায় যতীন্দ্রের চোখ জলিয়া উঠিল ! "তোমার ক্রেতা তোমার প্রভু মোহিত দত্ত ! স্বামী ব'লে আর গুমোর ক'রো না নিরজা, ক্রীতদাসীর মত তিনিতো তোমায় খুব চড়া দরেই কিনেছেন।"

উদ্যতফণা ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া নিরজা দ্বারের দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিল—"যাও, তুমি আমার বাড়ী থেকে চ'লে যাও। তাঁর বাড়ীতে ব'সে কি সাহসে তুমি তাঁর অপমান ক'রচো ? তিনি তোমায় চেনেন তাই তোমায় এ বাড়ীতে ঢুকতে দিতেই বারণ ক'রেছিলেন, কিন্তু আমি তোমায় চিনতুম না তাই এই,—"

"আমি তোমার প্রভুকে উল্লেখযোগ্য ব'লে মনেও করি না, তার কথায় আমার কি দরকার ! সে তোমার স্বামীই হোক—আর প্রভুই হোক, তুমি তার স্ত্রীই হও—আর ক্রীতদাসীই হও, সে খোঁজে আমার আসে যায় না। সে বোঝা পড়া তোমরা নিজেরাই ক'রো। আমি তোমার ভালবাসা তোমার একটু কৃপাদৃষ্টি মাত্র ভিক্ষা করি। পূর্ব্বের একটু স্মৃতিমাত্র মনে করিয়ে দিতে চাই। দত্ত এসে কেড়ে না নিলে তো তুমি আমারই হ'তে ? সেই কথাটা শুধু মনে রেখো !"

সভয়ে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া নিরজা সক্রোধে বলিয়া উঠিল—"আমি তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি, তুমি এক্ষুনি দূর হও ! নিজের অপমান আমি নিজেই ঘটিয়েছি। কোন সাহসে তুমি আমাকে এমন কথা ব'লতে পাল্লে ? আমি এখন অন্যের স্ত্রী, তুমি এখন আমার কে ? শুধু ছোটবেলার সঙ্গী ব'লে মায়া হয়,—স্নেহ হয়—তাই থেকে এতদূর হবে তা আমি,—ঈশ্বর জানেন, আমি স্বপ্নেও জানি না।"—

যতীন্দ্র আসিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া আবেগের সহিত বলিল—"নিরো, নিরো, নিরো, পায়ে ধরি আমার ওপোর রাগ ক'রো না ; যেওনা,

আমায় যেমন ভালবাসতে না হয় তেমনিই বেসো; আমি তার চেয়ে বেশী না হয় চাইবো না। কিন্তু তুমি একবারে নিষ্ঠুর হ'লে আমি বাঁচি কি ক'রে?"

"কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমি তোমায় ভালবাসতুম?—কক্ষনো না, কক্ষনো না। চুপ করো তুমি। এজন্মে আর তুমি আমার সঙ্গে দ্বিতীয়বার কথা কইবার চেষ্টা ক'রো না।"—

জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া জ্বলন্তদৃষ্টিতে তাহাকে স্তম্ভিত করিয়া নিরুজা ছুটিয়া লতাগৃহ হইতে বাহির হইয়া একেবারে নিজের শয়ন কক্ষে আশ্রয় লইল।

জল দিয়া সাবান দিয়া নিজের তুই হাত বার বার করিয়া ধুইয়া মুছিল। স্পর্শের কালিমা যেন সেই শুভ্র অকলঙ্ক হাতে দাগ মাখাইয়া দিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া তাহার সেই নির্জ্জন গৃহে তাহার পাণ্ডু-কপোল আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

নিচের ঘড়িতে আটটা বাজিয়া যাইবার পর, অল্পক্ষণ পরেই সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল ও পরক্ষণে তাহার গৃহদ্বারে আঘাত পড়িল। নিরজা বিস্মিত হইল; উঠিয়া বসিয়া কাপড় চোপড় ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিল—"এসো।"

বলিয়াই চমকাইয়া উঠিল—যতীন্দ্রনাথ নয় তো? নাঃ, এত সাহস কি কখন তাহার হইতে পারে? দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল আগন্তুক তাহার স্বামী!

রাত্রে নির্জ্জনে স্বামীর সহিত তাহার এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। তাহার বুকটা যেন হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল। সে সভয়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—উদ্দেশ্য কি?

তিনি ভিতরে আসিয়া পর্য্যঙ্কের অনতিদূরে দাঁড়াইলেন—বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে—শোনবার একটু সময় হবে কি?"

কথার স্বরে ও ভাবে ভয় পাইবার কিছুই ছিল না, লোকের অসাক্ষাতে তাহাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই রকম শিষ্টাচাররক্ষিত সাবধানতাপূর্ণ কথা-বার্ত্তাই প্রায় স্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি কি জানি কেন নিরজা একটু ভীত হইল, কুণ্ঠিতভাবে সে কহিল—"কি, বলো।"

তিনি যেন মনের কোন একটা বিশেষ ভাব গোপন করিয়া লইয়া তারপর একটু সচেষ্ট গম্ভীরভাবে কহিলেন—"প্রথমে জিজ্ঞাসা করি—তোমার কি আমায় কিছু বলবার আছে?"

"তোমায় বল্‌বার!" ভয়ে লজ্জায় নিরজা যেন একেবারে মরিয়া গেল। সে দৃশ্য ইনি কি তবে দেখেছেন না কি? ছি ছি কি ঘৃণা—কি লজ্জা! সে এতক্ষণ ধরিয়া, কি করিয়া এ লজ্জাস্কর ব্যাপার তাঁহাকে জানাইবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু যখন সে সুযোগ আপনা হইতে উপস্থিত হইল তখন ঘোর লজ্জায় তাহার মাথা মাটিতে মিশিয়া গেল। আচমকা বলিয়া ফেলিল—"না না কি আর ব'ল্‌বো! কি ব'ল্‌বো?"

মিঃ দত্ত তাহার আরক্ত মুখের দিকে একটু যেন বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে সে ভাবটাও চাপা দিয়া স্থিরস্বরে কহিলেন—"কিছুই তাহ'লে তো তোমার বলবার নাই? আচ্ছা আমার যা

বল্‌বার আছে বলি, আমি কাল ক'ল্‌কাতাতো যাচ্চিই,—সেখান থেকে শীঘ্রই মুসৌরি যাবো ; সেই কথা ব'ল্‌তে এসেছিলাম। তবে এখন যাই ?" হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া লইয়া কাশির ছলে রুমালখানা মুখে চাপিয়া মোহিত-কুমার চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু নিরজার ঘোর লজ্জা এইবার যেন ভয়ের তাড়নায়—ভয়ের যথার্থ কোন কারণ না থাকিলেও অনেক দূরেই সরিয়া গেল। তাহাকে কি এই বাঘের পিঁজরায় রাখিয়া যাইবেন না কি ? আজ সে কথা সে মনেও রাখিতে পারিল না। ধড় মড়িয়া খাট হইতে নামিয়া ছুটিয়া গিয়া স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিল। রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"না না তুমি যেওনা, আমায় একলা ফেলে যেওনা।"

মিঃ দত্ত হাত ছাড়াইয়া লইলেন। মুখ ফিরাইয়া অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"একলা কেন ? যতীন্দ্র ঘোষকে তো আট দিনের জন্য আপাততঃ নেমন্তন্ন ক'রেচ, সে ক'দিন তো তোমায় এখানে থাকতেই হ'চ্চে, তার পর যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, তা হ'লে না হয় তাকে আরও কিছু দিন থাকতেই ব'লো, আমার অমত নেই।"

"আমায় এখানে একলা ফেলে যেওনা, আমি থাকতে পারবো না, তুমি চলে গেলে আমি এক দিনও এখানে থাকবো না, তোমার পায়ে ধরি, আমায়ও নিয়ে যাও—"

চিরগর্ব্বিতা নিরজা বুঝি সত্য সত্যই স্বামীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়ে! সে কাতরকণ্ঠে বলিল—"একবার যখন পায়ে স্থান দিয়েছিলে, তখন আজ আবার আমার সব দোষ ক্ষমা করো। যেখানে যাবে আমায় সঙ্গে নাও।"

একটু সরিয়া গিয়া মিঃ দত্ত বিচলিত কণ্ঠে বলিলেন—"পায়ে কেন ; —না না, ও কথা ব'লোনা !—আমি তোমায় বুকের সমস্তটাতে জুড়ে রেখে দিয়েছিলুম, তুমিই নিষ্ঠুর আঘাতে সে বুকখানাকে চূর্ণ ক'রে

দিয়েছ। আজও সে অবহেলা আঘাত পলে পলে এ বুকে হাতুড়ির ঘা মারচে, সে আঘাত ব্যথা থেকে কই আজও তো নিস্কৃতি দিলে না ? এখনও কি তবে দেবে না ?"

নিরজা স্বামীর হাত ছাড়িয়া দিল "তোমার কথায় মনে হ'চ্চে তুমি সব জানো ! তা যদি হয় তবে জেনে, শুনে আমায় এ কিসের পরীক্ষা ক'রচো ?"

মোহিতকুমার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। পরে আকোবাকুল কণ্ঠে ডাকিলেন—"নিরজা" !

নিরজা সলজ্জ নেত্রে চাহিয়া দেখিল, তাহার স্বামীর মুখের ভাব কি কোমল কি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে ! তাহার সেই ফুলশয্যার কাল-রাত্রির কথা স্মরণে আসিল। লজ্জায় সে আর মুখ তুলিতে পারিল না।

মোহিতকুমার কহিলেন—"নিরজা শোন, সব তোমায় বলি। তোমার বাবার কাছে শুনে আমি তখনি বুঝেছিলেম, যতীন ঘোষই খাজনার টাকা ও কলের টাকা চুরি করিয়েছে ! তার পর সেই টাকায় তোমার বাবার সমস্ত সম্পত্তি কোন রকমে বেনামী ক'রে ও কিনে নেবে বলেই খাজনার জন্য সময়ে খপরও দেয় নি। তোমার বাবারও সেই সন্দেহ হয় আর তিনি সেই জন্য তোমাকে এই সূত্রে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হবার জন্যও ইচ্ছুক হন। যতীন ঘোষের উপর তোমার অগাধ বিশ্বাস, তুমি যদি এখনও কিছু আপত্য টাপত্য করো, বিশেষ তার সম্বন্ধে সমস্ত প্রমাণ জোগাড় না ক'রেই কোন দোষ আমরাতো প্রকাশ্যে দিতে পারবো না। সেই জন্য আমাকে এরূপ দোষী ক'রেছিলেন। যা হোক এত দিনের চেষ্টায় আমি সব প্রমাণপত্রই যোগাড় ক'রেছি। দু তিন দিনের মধ্যেই যতীন ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হবে ; সেই জন্যই তোমায় তাকে বাড়ী আনতে বারণ ক'রেছিলেম। তা ভিন্ন অপর কোন গোপন কারণ ছিল না। তত 'ছোট' মন আমার সত্য সত্যই নয় !"

শুনিয়া বজ্রাহতের মত নিরজা আড়ষ্ট হইয়া রহিল। তারপর সে ক্রমে যেন পতনোন্মুখ হইল।

ব্যস্ত হইয়া মোহিতকুমার পত্নীকে সন্তর্পণে ধরিয়া শোয়াইয়া দিলেন। পাখাটা লইয়া কাছে বসিয়া বাতাস করিতে করিতে সে অল্প পরেই সামলাইয়া লইয়া চোখ চাহিল, স্বামীর দিকে চাহিয়াই তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মোহিতকুমার ব্যথিত হইয়া বলিলেন—"কেঁদো না, ছিঃ!"

নিরজা উঠিয়া বসিয়া করুণচক্ষে স্বামীর দিকে চাহিল, সকাতরে বলিল—"আমায় ক্ষমা ক'র্ত্তে পার্ব্বে?"

মোহিতকুমার মুখ নত করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন—"যদি চাও তো কেন ক'র্ব্বো না?" তাঁহার নিজের দুই নেত্রে তখন অশ্রু ভরিয়া উঠিয়া পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে।

নিরজা আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আমি প্রাণের সঙ্গে ক্ষমা চাইচি—আমায় বিশ্বাস ক'র্ব্বে? বলো তোমার আমার প্রতি অবিশ্বাস নেই? বলো তুমি আমায় কখন অবিশ্বাস করো নি?"

মোহিতকুমার মৃদু আবেগের সহিত উত্তর করিলেন—"তা ক'রলে নিরজা বোধ হয় আমি এতক্ষণ বাঁচতুমই না। বোধ হয় আমি তোমায় এক মূহুর্ত্তের জন্যও অন্যচিত্ত দেখলে তখনি আত্মঘাতী হ'য়ে মরতেম। তুমি আমায় চেন না।"—

"আঃ আমি বাঁচলেম, আমায় ক্ষমা ক'রলে?"

" 'ক্ষমা'! জান না তো তুমি,—তোমার আজকের ব্যবহার আমাকেই তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এনেছিল। শুধু তুমি কি বলো তাই দেখছিলাম। স্বীকার করি সেটুকু আমার দুর্ব্বলতা, কিন্তু ক্ষমা করো সেটুকুর লোভ ছাড়তে পারি নি;—অনর্থক তোমায় কষ্ট দিয়ে নিজে একটু সুখী হ'য়ে নিয়েছি।"

নিরজা তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার হাত নিজের কম্পিত হস্তে ধারণ করিল।—"আমায় ভালবাসবে? বলো আমায় অবহেলা ক'রবে না? তোমার ভালবাসার মূল্য আজ আমি খুবই বুঝেছি। এ জিনিস হারালে আমি আর সে ক্ষতি কিছুতেই সইতে পারবো না।"

মোহিতকুমার হৃদয়ের প্রবল আবেগ চেষ্টার সহিত রুদ্ধ রাখিয়া ঈষৎ অভিমানজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"তুমি তো আমার ভালবাসা চাও নি নিরজা?"

"আর যদি আমি এখন ভিখারীর মত তোমার পায়ে ধ'রে তোমার ভালবাসা ভিক্ষা করি? যদি আমি সে দিনকার অনাদৃত আদর নিজে যেচে সেধে বুকে তুলে নিই, তাহ'লেও কি আর সে দিনের সে অপমান তুমি সম্পূর্ণ ভুলে যেতে পারো না? মহৎ হৃদয় তোমার, মহত্ত্ব তো প্রতিশোধ খুঁজিতে পারে না!"

"আমি মহৎ নই নিরজা, মানুষ যে, সে মানুষ! আশা তৃষ্ণায় ভরা—স্নেহ প্রেম বুভুক্ষিত মানুষের প্রাণ—সে তার পাওনা ফেলে মহত্ত্বের ভার নিয়ে দূরে ব'সে থাকতে পারে না। তার সব পাওনা সে আদায় ক'রতে চায়। মহৎ ব'লে নয়, আমি তোমায় ভালবাসি ব'লেই সব ভুলেছি. কিন্তু এখন আরও ভুলে গেছি কেন জান, সাধ্বী স্ত্রীর স্বামী ব'লে।"

নিরজা স্বামীর কথায় আগ্রহে বাধা দিয়া বলিল—"না আমায় নিরজা ব'লোনা, তেমনি ক'রে 'নিরো' ব'লে ডাকো। তোমার মুখে সেই ডাক না শুনলে আমার যেন তৃপ্তি হ'চ্চে না।"

"তুমি একবার নিজের মুখে তাহ'লে বলো সত্যই তুমি এখন আমায় ভালবাসো? আমার তাহ'লে সে কথা মনে করা সেদিন দুঃসাহস হয়নি? মনে আছে, নিরো সে কোন কথা? সেই 'ভালবাসার' কথা।"—

নিরজা আনন্দসজল চক্ষু তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিল। "আবার সেই কথা! মনে করোনা কেন সেটা একটা দুঃস্বপ্ন! আজই আমাদের ফুলশয্যার রাত্রি!"

প্রবল আবেগের সহিত মোহিত নিরজার হাত ধরিলেন—"নিরো, তবে আমারই জিত। এ সর্ত্তটা দেখ্‌চি আমারই তাহ'লে বজায় রইলো? অনেক মোকদ্দমা আমি জিতেছি কিন্তু এত বড় জয়ের আনন্দ বোধ করি আমি আর কখন পাইনি। কিন্তু এটায় আমিই ছিলাম আসামী, না?"

লজ্জায় লাল হইয়া নিরজা স্বামীর বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহারি বিশাল হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া, অস্ফুট মৃদুস্বরে কহিল—"আমি নিতান্ত নির্ব্বোধ তাই নিজের মনও এতদিন বুঝিনি। তোমায়ও কষ্ট দিয়েচি নিজেও কি কম কষ্টটা পেয়েছি! আমারই কি কোন স্বস্তি ছিল? দেখেচতো আমি কোথাও যাইনি। কারু সঙ্গে মিশিনি, কিছুতে মন দিতে পারি নি। কেবল মনের আগুনে পুড়ে ম'রেচি।"

"নিরো, নিরো, তাহ'লে আমাদের মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হ'তে পারলো? এ যে আজ স্বপ্ন মনে হ'চ্চে নিরো, সত্যি তুমি আমায় এত ভালবাস্‌লে কি ব'লে?"

"আঃ তুমি কেবলই আমায় লজ্জা দেবে।"—

এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার যে স্নেহের বাহু সে সগর্ব্বে কণ্ঠ হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল, আজ স্বেচ্ছায় পুষ্পমাল্যের মত আদর করিয়া সে সেই বাহুবন্ধন নিজেই কণ্ঠে তুলিয়া লইয়া আপনাকে পূজার ফুলটির মতই নিজের যথার্থ যোগ্যস্থানে সঁপিয়া দিয়া সে মৃদুস্বরে বলিল—"আমি তো হার মান্‌চি! আমি তোমার স্ত্রী, তোমার দাসানুদাসী, তোমায় ভালবাসবো না?"

ভুল ভাঙ্গা।

১

কতকটা মূলধন না রাখিয়া ব্যবসা করা যায়না, কিন্তু কাব্য উপলব্ধির শক্তি না থাকিলেও বাঙ্গালা মাসিকপত্রের সম্পাদকতা করা এতটুকু অসম্ভব নহে। এমন ঘটনা যে নিত্যই ঘটিতে পারে এবং ঘটে ইহার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য কোন জীর্ণ পুঁথি বা পাথরের নুড়ি ঘাঁটিতে হয় না। তবে কথাটা শুনিতে একটু হেঁয়ালীর মতই ঠেকে। (মূলধন না রাখিয়া ব্যবসা করিতে গেলে দেখা যায় উঠ্‌তি মুখেই অনেক সময় ব্যবসাটাকে মাথা হেট করিতে হয় এবং মহাজনের দ্বারে লালবাতির রক্তশিখা আপনি জ্বলিয়া উঠে) কিন্তু মাসিকপত্রের পৃষ্ঠে চড়িয়া মা লক্ষ্মী আপনার উদারতা প্রদর্শনে এতটুকুও শৈথিল্য করেন না। কাব্যরসগ্রহণে অক্ষম সম্পাদকের পরিচালনে পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা ক্রমশঃই বেশ ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠে।

অজিতনাথ কিন্তু এ দলের লোক নয়। সে প্রায় বাল্যাবধিই কাব্য-লক্ষ্মীর দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া আছে। লেখক হইবার শক্তি নাই থাক, পরের লেখার ভাবগ্রহণের ক্ষমতার তাহার অভাব ছিল না। স্কুলের পড়া বাঁচাইয়া একখানি ছোট খাতায় রবিবাবুর ভাল ভাল কবিতাগুলি টুকিয়া লওয়া একটা অবশ্য করণীয় ব্রতের মতই তাহার জীবন-গ্রন্থীর সঙ্গে জোট পাকাইয়া গিয়াছিল। ওই ধরণে কাব্য লিখিয়া অমরত্ব লাভের ইচ্ছা বাঙ্গালা দেশের কোন ছেলের না হয় যে, তাহারও হইবে না? শেষে অনেকগুলি ছোট বড় কবির উমেদারীতেও যখন তাহার এই বলবতী ইচ্ছা অপূর্ণই রহিয়া গেল, কোন কবিই তাঁহার

কবিত্বশক্তির অংশ তাহাকে দাম লইয়া বিক্রয় করিতে পারিলেন না। তখন সে কবিযশ প্রার্থণা ছাড়িয়া আবার সে পরমোৎসাহে দেশী বিদেশী বড় বড় কবিদের বিখ্যাত রচনাগুলি খাতায় টুকিয়া মুখস্থ করিয়া কাব্য-রস পিপাসার নিবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইল, একটুও দমিয়া পড়িল না।

আজ কাল অজিতনাথ "মলয়া" পত্রিকার সম্পাদক। মোটা সোটা কাগজ খানিকে চিত্রে সাজাইয়া মাসের প্রথম দিনেই সে জনসাধারণের চোখের সামনে বাহির করিয়া দেয়। মেয়ে মহলে হাতে হাতে ঘুরিয়া কাগজখানা দুই দিনেই ঝর-ঝরে কালী মাখা তৈলসিক্ত হইয়া প্রমাণ করিয়া দেয় ইহার পাঠক সংখ্যা বড় অল্প নয়। তবে গ্রাহক কতগুলি সে খবর আমরা না-ই দিলাম। যে দেশে একজন একখানা বই কিনিলে তাহার প্রতিবেশী এবং তস্যক্রমে কএক'জন প্রতিবেশীর তাহার উপর দখলী সত্ব স্বতঃসিদ্ধ, সেখানে পাঠকের সহিত গ্রাহকের সম্বন্ধ খুব নিকট নাও হইতে পারে, আর তাহাতে বিস্ময়ও কিছু নাই।

২

"মলয়া"র লেখক লেখিকাদলের মধ্যে একজনের নাম আজ কাল বঙ্গসাহিত্যে-ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। গদ্যে পদ্যে এমন দখল প্রায় অল্প লেখকেরই দেখা যায়।—বিশেষ করিয়া কবিতায়। সে কি বিস্ময় পুলকসঞ্চারী শব্দ-লহরী, বীণার কোমল মধুর ঝঙ্কার! মৃদঙ্গের মৃদু-গম্ভীরনাদ! এ সব তাহারই নিজস্ব। এমনটি বুঝি আর কখনও শুনা যায় নাই! পূজা আসিয়া পড়িল। পূজার সংখ্যাকে ভাল করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া ঘরের ছোট শিশুটির মত পূজার বাজারে বেড়াইতে পাঠাইতে হইবে। অজিত রচনা নির্ব্বাচনে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সংখ্যায় "সাংখ্য কি নিরীশ্বরবাদ?" "বৌদ্ধ দর্শন নাস্তিক দর্শন অথবা আস্তিকদর্শন?" ইত্যাদি এই সব গুরু গম্ভীর প্রবন্ধ চলিবে না। কবিতায় গল্পে ইহার প্রতি পৃষ্ঠা ভরাইয়া দিতে হইবে।

শ্রীমতী কনকপ্রভা বটব্যালের কবিতা এ সংখ্যায় একাধিক ছাপা চাই। তদ্ভিন্ন একটী ছোট গল্প।

কবিতা দুটির নাম দেওয়া হইয়াছে, "আগত" এবং "স্বাগত"—আগমনীরই সেই চিরন্তর সুর কিন্তু কি এক নূতন অশ্রুতপূর্ব্ব নূতনত্বে ভরা অভিনব ছন্দে নব কলেবরে নবীন রূপ ধরিয়া ইহারা দেখা দিয়াছে। সম্পাদক অজিতনাথ মুগ্ধ চিত্তে পড়িল,—

"রক্তজবা-বিল্বদলে-ভক্তি-অর্ঘ্য সজ্জিত, হেম-থালি পূর্ণ, সিক্ত সেফালিকা গাঁথা মালা হাতে শারদ প্রকৃতি তোমার পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাশাংশুকের অঞ্চল মৃদু মন্দ পবনে ঈষৎ কম্পিত। শ্যাম-শৈবাল রচিত বসন ঐ রক্ত-পদ্ম-চরণদুটী চুমিয়া আছে। এসো মা—ওই উন্মুখ আবাহনের আহ্বান-গীত-রবে অম্বর আজ পরিপূরিত হইয় উঠিয়াছে। সেই গানের তালে তোমার ওই অভয়চরণ ফেলিয়া ভক্ত হৃদয়পদ্মোপরি অধিষ্ঠিতা হইতে এস মা, এস।"

এমনি কত ভাবের আবেগে পরিপূর্ণ সেই আগমনীর গান। "স্বাগতে"ও সেই একই বীণার তারে বিভিন্ন মূর্চ্ছণা!

অজিতনাথের চিত্ত বীণার তারে তারে সেই ঝঙ্কার রণিয়া উঠিতে লাগিল। কাশাংশুকপরিধৃতা সেফালী-মাল্য ধৃত করা রক্তোৎপলদল-শোভিতচরণা শারদজোৎস্নাগঠিত মূর্ত্তি তাহার মানস নেত্রে উজ্জ্বলচিত্রে ফুটিয়া উঠিল। নবদূর্ব্বাদলে জবার অর্ঘ্য রচিত, দশভূজা সিংহবাহিনীর অভয়বরবিতরণকারী চরণতলে ভক্তিবিগলিত স্থিরদৃষ্টি সংস্থাপিত—যেন অভয়ার পার্শ্বচারিণী বীনাপানী সহসা কি ভাবের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার পদপ্রান্ত চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন!

এ কার মূর্ত্তি! এ কার রূপ! যিনি এ চিত্র মোহন-তুলিকায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারই নয় কি?

সে দিব্য চক্ষে দেখিতেছে এ সেই সৌন্দর্য্য-প্রতিমা, কুমারী মূর্ত্তি!

কুমারী মূর্ত্তি! হাঁ, তা নয় ত কি? এ মূর্ত্তি কি কুমারী ভিন্ন আর কাহাকেও মানায়? বিশ্বের রাণী বিষ্ণুজায়া হইলেও সেই সিতাব্জাসীনা লেখ্য-পুস্তক-ধারিণী দেবী সরস্বতীকে কেহ কোন দিন সে সম্পর্কে আনিবার চেষ্টা মাত্রও করে নাই। কুমারী তরুণী মূর্ত্তিতেই তাঁহার চির-আরাধনা। কুমারী কনকপ্রভাও তাঁহার শরীরিণী ছায়া—তবে তিনিই বা কুমারী না হইবেন কেন? নামের প্রথমে শ্রীমতী না লিখিয়া কুমারী লিখিলেই বেশ মানায়; কিন্তু কি জানি যদি তিনি বিরক্ত হন! তাই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অজিতের সাহস হয় নাই।

অজিতনাথ রচনাগুলি প্রেসে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে কতকগুলা তাহারই পুরাতন রচনা লইয়া বসিল। প্রতি সংখ্যাতেই কনকপ্রভার কনকাঙ্গুলির ছাপ সোণার অক্ষরের মতই কালোকালীর ছাপার মধ্য হইতে জ্বল-জ্বল করিত। সে সব রচনার বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে কি মায়া কি মোহ ছড়ান রহিয়াছে। ষোলরাগ ও ছত্রিশ রাগিনী সেখানে চিরবসন্ত-নন্দিত নন্দনের অপ্সরাকণ্ঠে চিরধ্বনিত। অজিত-নাথের বুকে পুলকের তড়িৎ খেলিয়া গেল। আহা, সে কত ভাগ্যবান! এমন একটী হৃদয়-ভাণ্ডারের অফুরন্ত রত্নৈশ্বর্য্যের জমার খাতাখানি তাহারই হাতে! সে মুগ্ধচিত্তে পুনঃ পুনঃ পঠিত সেই সব কবিতা আবার পড়িয়া যাইতে লাগিল। এমন সে কত সময়ই করে। এগুলি তাহার আগাগোড়া প্রায় সবই কণ্ঠস্থ, তথাপি ইহারা কখন নূতনত্ব হারায় না। শুনা গিয়াছিল কি একটা ফল খাইলে, মানুষ যে বয়সে সে ফল খায়, ঠিক সেই বয়সেই থাকিয়া যায়। এই রচনাগুলির মধ্যে বুঝি সেই ফলের অজ্ঞাত শক্তিটা প্রচ্ছন্ন ছিল?

"কাননলতা" কবিতাটি যেন তাঁহারই নিজের ছবিখানি! বিজন অরণ্যের অন্তরালে সলজ্জ শ্রীমণ্ডিতা ক্ষুদ্র বন-লতাটী উদ্যান-লতাকে পরাভব করিয়া তপোবনের শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে। ঋষিতনয়ার

অপরিস্ফুট যৌবনের প্রথম উন্মেষে মানসিক বৃত্তিগুলির প্রথম বিকাশের অতি গোপন সংবাদ শুধু এই সখী কাননিকার কানে আভাষে পৌঁছিয়াছে, এ সংবাদ আর কেহ কখনও অবধি পায় নাই। তথাপি পাতায় লতায় আকাশে বাতাসে একটা কানাকানি, একটু হাসাহাসি বহিয়া চলিয়াছে। ভ্রমর ছুটিয়া আসিয়া এই নূতন খবরটার জন্য বন-লতার কাণে কাণে অনেক তোষামোদের কথা শুনাইল, শেষে রাগ করিয়া চলিয়া গেল, বুঝি আর আসিবে না,—এমনি কঠোর শাসাইয়া গেল, তথাপি—সে নিজের সর্ব্বস্ব ছাড়িয়াও সখীর বিশ্বাস ভঙ্গ করিল না। কিন্তু প্রিয়-বিরহিত এ জীবন কি বহা যায়? নির্জ্জন কাননতলে একদিন সে শুকাইয়া ধরালিঙ্গন করিল। কেহই তাহার জন্য কাঁদিল না, নিষ্ঠুর ভ্রমর আর ফিরিয়াও চাহিল না। শুধু বাতাস একবার হা-হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তারপর সব শেষ! আহা, না, না! এমন ধারা হইতেই পারে না। কোথাকার কে কঠিন ভ্রমর, তাহার নির্ম্মম অত্যাচারে স্বর্গের ঐ লতা শুকাইবে? অসম্ভব! সে ইহা সহিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই সে এই হৃদয়হীনতা হইতে এই কোমল বক্ষখানি অক্ষত রাখিবে।

আবার এক ধারে এ কি উন্মত্ত আবেগময় হৃদয়ের প্রচণ্ড বেগ-ব্যাকুল প্রেমধারা লইয়া "পদ্মার সিন্ধু দর্শনে যাত্রা"! কৌমার প্রেমমণ্ডিত নারী হৃদয়ের কি সুন্দর প্রকাশ! ওরে সিন্ধু, আরও স্ফীত হ,' আজ কোন্ হৃদয়-ধারা লইয়া তোর ও লবণাক্ত ফেনিল তরঙ্গগুলার উন্মাদ নর্ত্তনকে দেখ্ কে' ওই শান্ত শীতল করিতে ছুটিয়াছে! তুই তার কি বুঝিবি?

৩

অজিত নিজের মধ্যে একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল। একটা কিছুকে কেন্দ্র করিয়া যেমন তাহার চারিদিক আবর্ত্তন করিয়া

ফেরাই জগতের ধর্ম্ম, তেমনি ঐ কল্পনাময়ী নারীটিকে মাঝখানে রাখিয়া তাহার সহস্র কল্পনা তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া ঘুরিতেছিল। পদ্মের মধ্যটিতে মধুলোলুপ মৌমাছির মত তাহার সারা চিত্ত ইহারই রচনার ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন, আবদ্ধ। সে তাহার লেখিকার ছায়ারূপে এই রচনা-গুলিকে দেখিতে দেখিতে তাহার পরিসর বাড়াইয়া এখন নিজের সঙ্গে এমনি জড়াইয়া ফেলিয়াছে যে সহস্র ক্ষতি লোকসান সহিয়াও সে এখন এই কাগজখানা উঠাইয়া দিতে অক্ষম। এজন্য লাঞ্ছনার ঝড় উঠিয়াছে, কন্যাদায়গ্রস্থ পিতৃবর্গের অভিশাপের সঙ্গে নিজের মা বাপের ক্রোধবহ্নিও ধোঁয়াইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু অজিতের হৃদয় তখন কনকপ্রভার অবলম্বন চাহিয়া ব্যাকুল, তখন সেখানে কোন্ গ্রামের সে এক কোন্ নোলোক-পরা ছোট মেয়েটীর প্রবেশাধিকার কোথায়? সে এই মানসীর স্বহস্ত-চিত্রিত আলেখ্যগুলি দিয়াই দিব্য নেত্রে তাহাকে দেখিতে পায়। তাহার সহিত তাহার হৃতাশ-কবিত্বের সমুদয় অব্যক্ত কল্পনার যোগ করিয়া সে আপনার জীবন-যৌবন-আশা-কল্পনা সমস্তই সকল মনে করে। কখনও মনের মধ্যে নিমেষের মধ্যে চকিত একটু দর্শনাকাঙ্ক্ষা যে না জাগে এমনও নয়। আধ-তন্দ্রাঘোরে সহসা কোন দিন একটা ক্ষুব্ধ বাসনা প্রচ্ছন্নতা ছাড়াইয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়া দুই বাহু বাড়াইয়া বলে, "দেখা কি হবে না? ওগো মামস-মন্দিরের পুণ্য দেবতা! এ শূন্য সিংহাসনে ও চরণ-স্পর্শ কোন দিন হবে না কি?"

কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে অবসর ঘটে নাই। ১২।৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটা কোন্ "প্রাসাদ" হইতে বাহির হইয়া একখানি সরকারি লেফাপামধ্যবর্ত্তী একটুখানি পত্রাংশ মধ্যে মধ্যে তাহার হাতের মধ্যে আত্মনিবেদন করিয়া দেয়। লেখাটুকু মুক্তাপংক্তির মতই সুন্দর, যেন ইহাতে কুঁদিয়া-কাটা পাথরেরই সূক্ষ্ম-শিল্প! ইহাতে প্রায় এইটুকুই শুধু লেখা থাকে—

"সবিনয় নিবেদন,

'অমুক' শীর্ষক কবিতাটী পাঠাইলাম। প্রুফটী ভাল করিয়া দেখার বন্দোবস্ত করিবেন।"

শ্রীকনকপ্রভা বটব্যাল।"

হায় পাষাণি! ভাল করিয়া প্রুফ দেখার বন্দোবস্ত তুমি বলিলে তবে করা হইবে! সে যে দুই চক্ষু ঠিক্‌রাইয়া চক্ষের মণি বাহিরে আনিবার যোগাড় করিয়া তুলিয়া সমস্ত প্রুফগুলা বরাবরই নিজে দেখিয়া আসিতেছে। তবু প্রতিবারেই এই একই অনুরোধ! তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসে।

৪

এবার পূজার ছুটিতে পাঁচবন্ধু মিলিয়া কোথাও একটা বেড়াইতে যাওয়ার বন্দবস্ত হইয়াছে। অনেক তর্ক বিতর্কের পর যাওয়া স্থির হইল, হাল্ ফ্যাসানে নূতন হাওয়া খাওয়ার জায়গা রাঁচী। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একবার পাঁচজনের সঙ্গে দেখা শুনাটুকু সারিয়া লওয়া চাই। অজিতনাথ হালিসহরে মামার বাড়ী হইতে কলিকাতা ফিরিতেছিল। শরতের অম্লানোজ্জ্বল সুন্দর প্রভাত। স্বর্ণাভ রৌদ্রে হরিৎ ধান্য-শিশুগুলি লঘু নৃত্য করিতেছিল। বর্ষার জমা জলের ধারে কাশের শ্রেণী সারি বাঁধা বকের মতই শুভ্র অঙ্গ মেলিয়া দিয়াছিল। বিলের মধ্যে মাছরাঙ্গা মাছ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ঝোপে-ঝাড়ে ফলটা-ফুলটা ও ফুটিয়া ফলিয়া আছে। অজিত সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাশাংশুকা সুন্দরীর কনক-কান্তিটুকু ধ্যান করিতেছিল। আহা, সেই স্থির-সৌদামিনী-প্রভ কুমারী মূর্ত্তি আজ এই শরৎ প্রভাতে কোন পূজাগৃহের আগমনী গানের তানের মধ্যে সুরভিচিত্ত ধূপটুকু জ্বালিয়া দিয়াছে! সে কোনখানে?—

গাড়ীখানা থামিয়াই আবার চলিতে আরম্ভ করিল। "পল্‌তা" "পল্‌তা"" শব্দটা ট্রেণের বাঁশীর একটা উৎকট চীৎকারে ডুবিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই প্লাটফর্ম্মের উপর একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। অনেক

মোট মুটরী কুলির মাথায় চাপাইয়া একপাল কাচ্চা-বাচ্চা সঙ্গে একদল রেলের যাত্রী,—স্ত্রী পুরুষ লইয়া প্রায় সাত আট জন,—এ ছাড়া দাসী, সরকার, চাকর, গোমস্তা,—সেও প্রায় বাড়ীর লোকের সম-পরিমাণ,—ট্রেণ ধরিবার জন্য হুড়াহুড়ি করিয়া প্লাটফরমে প্রবেশ করিয়াছিল। ট্রেণ এক মিনিট মাত্র থামে। অনেক "লট হবর"—তাড়াতাড়িতে যে যেখানে পারিল, উঠিয়া পড়িল। দাসীগুলা কচি ছেলে কোলে, কনে বউরা ঘোমটা ফাঁক করিয়া প্রায় ছুটাছুটি করিয়া যে গাড়ীতে একদল ডেলী প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে অজিতনাথ বসিয়াছিল, সেইখানেই উঠিয়া পড়িল। বাড়ীর কর্ত্তাগোছের একটী স্থূলোদর বাবু মোটা গলায় হুকুম জারি করিতে ছিলেন, "ওগো মেয়েরা এক গাড়ীতে উঠো। গিন্নি, ও গিন্নি—না, না, এইটেতে,—বিন্দি, তোমাগীর জ্বালায় অস্থির হ'য়েছি। হাঁ করে দেখচিস্ কি? চট করে উঠে পড় না।"

একখানি নিকষকৃষ্ণপ্রস্তরের কালীপ্রতিমার ন্যায় বর্ণশালিনী এক স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গাড়ীর দরজা কোন মতে ঠেলিয়া সামনের বেঞ্চে বসিয়া পড়িয়া খুব চীৎকার শব্দে হাঁক-ডাক লাগাইয়া দিলেন "ওরে নন্দে, ঐ রামফল, ইধার, ইধার! ওরে সব আয়না।" রমণীর কেশ-বিরল মস্তক হইতে গরদের চাদর খসিয়া পড়ায় তৈলরঞ্জিত টাকটুকু সর্ব্বজনগোচর হইয়া পড়িল, সহযাত্রিদের মধ্যে দুই একজন ঈষৎ ব্যঙ্গমিশ্রিত মৃদু হাসি হাসিয়া সরিয়া গেলেন। স্বেদস্রুতিতে নারীর সর্ব্বশরীরের বসন ভিজিয়া গিয়াছিল এবং উদ্বেগে ও পরিশ্রমে সমস্ত শরীর থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

কোলাহলের মধ্যে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। দুইটা কাপড়ের মোট, ছেলেদের দুধের বোতল কয়টা ও জলের কুঁজা প্লাটফরমে পড়িয়া রহিল,—আর রহিলেন তদারকপরায়ণ বাবুর সহিত বাড়ীর সরকারটী। ছেলে মেয়েরা দাসীগুলার সুরে সুর চড়াইয়া মহা হল্লা জুড়িয়া দিল। গৃহিণী

হাঁপানি-যুক্ত গর্জ্জনে ভগ্ন কাংশের স্বর মিশাইয়া গাড়ীর কামরা স্তম্ভিত করিয়া হাঁকিলেন, "বিন্দি হতভাগীর জ্বালাতেই তো এই হ'ল! সং মাগী যে কল্লা ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি, তোকে ডাকাডাকি ক'রতেই তো গাড়ী ছেড়ে দিলে,—বাড়ী গিয়ে যদি তোকে না জবাব দি'তো আমার নাম নেই। বউমা, তোমারই বা কেমন বে আক্কেলে কাণ্ডটি বাছা! কচিছেলের মা দুধের বোতলটিরও ঝক্কি নিতে পার না! এত নবাবী কেন? এখন খাওয়াও ছেলেকে কি খাওয়াবে!—দেখ্ বিষ্ণু, এখনি পড়ে খুন হবি, বল্‌চি, শীগ্‌গির সোরে বস্। মা—মা—মা এদের জ্বালায় কোথাও গিয়ে সোয়াস্তি নেই! বাড়ী ছেড়ে দুদিন মায়ের কাছে জুড়ুতে গেলুম, তা সঙ্গে চল্‌ল, ছাপ্পান্ন কোটী যদুবংশ। এখন এই সব ঝি—বৌ কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে আলদায় ব'সে থাকিগে চল। দুজনের একজনও যে উঠতে পেলে না। জানি ও নরে হতভাগাটা যখন সঙ্গে এসেছে—ওকে নিয়ে কখনো কোন উবগার আছে যে আজ হবে?" রমণী তীব্র তাপযুক্ত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সকলকার উপরেই অঙ্গজ্বালা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অজিতের মনে হইতেছিল এ যেন স্বয়ং মহিষাসুরমর্দ্দিনী ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়া পাষণ্ড-দলনে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। একা তিনি ভিন্ন এ ক্ষেত্রে সকল লোকেই কুড়ে অকর্ম্মণ্য ও অনাবশ্যক বোঝা মাত্র! ইহাদের কার্য্য পণ্ড করিবার শক্তি অপরিসীম। ইহারা যখন সঙ্গে আসিয়াছে তখন এইরূপ একটা কিছু বিভ্রাট ঘটিবে, ইহা যেন নিশ্চিত হইয়াই ছিল।

গাড়ীর গতির সঙ্গে সঙ্গে সেই রসনার ক্ষুর-ধারাও সমানে বহিয়া চলিল। অজিতের ললিত স্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছিল, তথাপি পূর্ব্বাহ্নের গোলাপী নেশার আমেজটুকু একেবারেই উড়িয়া যায় নাই। এই কুদর্শনা কালিন্দীর কর্কশ কণ্ঠ সেই কুসুম কোমলার পাশে সে কি হাস্যরসই ফুটাইয়া তুলিয়াছে! মনে মনে হাসিয়া কাছেরই একটী ছোট ছেলেকে

ডাকিয়া লইয়া সে তাহারই সহিত আলাপ করিতে মনোযোগী হইল। ছেলেটির গায়ের রং রীতিমত ময়লা হইলেও মুখশ্রীটুকু বেশ। কথা কওয়া যায়!

"তোমার নাম কি খোকা? ষষ্ঠীপ্রসাদ? বাঃ বেশ নাম তো! বাড়ী কোন খানে?" ছেলেটী লজেনজেস্‌গুলি মুখে পুরিয়া এগালে ওগালে লইয়া নাড়িতেছিল, একদিক ভারী করিয়া গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "কল্‌কেতা।"

"কল্‌কেতা? কল্‌কেতার কোন খানে?"

"আমাদের বাড়ী আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।"

নীল আকাশের বুক চিরিয়া বিনামেঘে বিদ্যুৎ খেলিলে চাতক যেমন ঊর্দ্ধে চাহে, অজিত তেমনি করিয়া চাহিল, "ক—ক—কত নম্বর? তোমাদের নম্বরটী কত? নম্বর জানতো?"

"জানি। ১২।৫ নম্বর।"

রামগিরির যক্ষ প্রথম আষাঢ়ের মেঘকে কুটজ কুসুমের অর্ঘ্য দিয়া স্বাগত জানাইয়াছিল। ওরে হতভাগা অজিত! তুই এ কোমলকান্তি শিশু দূতটিকে কি দিবি? পকেটে একখানা পকেট-বুক ও একটী মণি-ব্যাগে দুই চারিটা টাকা! সর্ব্বশরীরের পুলক রোমাঞ্চ বোধ করিয়া কম্পিত কণ্ঠ মৃদুতর করিবার চেষ্টা করিতে করিতে সে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "কুমারী কনকপ্রভা সেই বাড়ীতে থাকেন বুঝি? তিনি কাগজে লেখেন না?"

ছেলেটি ঘাড় নাড়িয়া খুব গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, "হ্যাঁ লেখেন তো। একটা বই ছাপা হয়েছে—আপনি দেখেছেন?"

"হ্যাঁ দেখেছি, দেখেছি বইকি। তিনি বুঝি বাড়ীতে আছেন? বাড়ীতে পুজো হয় বুঝি? তাই বুঝি তিনি পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত